গল্পের
ক্যানভাসে
আঁকা
জীবন
মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

শুরুর কথা

প্রথমে ভেবেছিলাম গল্পস্বল্প-স্বল্পগল্প ধারাক্রমের গল্পগুলো দিয়ে টেনেটুনে একটা বই হয়তো করা যাবে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ, বইয়ের প্রায় পাঁচটা খণ্ড বের করার মতো লেখা তৈরি হয়ে গেছে। আল হামদুলিল্লাহ।

প্রথম দিকে, গল্পগুলোর শেষে উপদেশ দেয়া ছিলো। আপত্তি উঠলো, উপদেশ আমরা না দিয়ে বিষয়টা পাঠকদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। পাঠক নিজেই একটা উপদেশ ভেবে নিবে; সেটাই হবে সবচেয়ে সুন্দর। আমরা তাই করেছি।

আমরা প্রথম খণ্ডেও বলেছি, এই গল্পগুলো আমাদের নিজেদের বানানো নয়। গল্পের ভাবগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি। তবে হ্যাঁ, গল্পগুলোর ভাষা আমাদের। আমরা চেষ্টা করেছি, চারটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে; ছোট, সোজা, মজা আর গেযা।

এক : গল্পগুলো যাতে ছোট হয়; বড় না হয়। এক মিনিটেরও কম সময়ে একটা গল্প পড়ে ফেলা যায়। সেজন্য অহেতুক বর্ণনায় যাইনি। গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করারও চেষ্টা করিনি। শুধু গল্পটা বলার জন্য যতটা কথা বলা প্রয়োজন ততটাই বলার চেষ্টা করেছি।

দুই : গল্পগুলো যেন পড়তে সহজ হয়, ভাষাগত জটিলতা যেন না থাকে। সর্বস্তরের মানুষ যাতে গল্পগুলোর মূল ভাবটা ধরতে পারে।

তিন : গল্পগুলো যেন মজাদার হয়। আগ্রহ করে পড়া যায়। পড়তে আনন্দ লাগে– এমন হয়, এ দিকটাও লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি।

চার : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, তা হলো, গল্পগুলো যেন 'গেযাদার' হয়। গেযা মানে হলো খাবার বা খোরাক। গল্পগুলোয় যেন হৃদয়-মনের খোরাক পাওয়া যায়।

পাঁচ : পাশাপাশি আরেকটা বিষয়ও লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি, গল্পগুলো যেন, একদম পরিচিত না হয়। কিছুটা হলেও নতুনত্ব থাকে।

প্রথম খণ্ডের প্রতি সবার সমাদর দেখে আমাদের মনে সাহস জেগেছে– দ্বিতীয় খণ্ড ছাপানোর ব্যাপারে। আপাতত আমাদের হাতে পাঁচটা খণ্ড তৈরি আছে। খুব শীঘ্রই সেগুলো ছাপার মুখ দেখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোচ্চ তাওফীকদাতা।

আমাদের একটা তামান্না, আমদের এই গল্পধারার আওতায়, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, ধর্মীয় ও সামাজিক, শিক্ষা ও অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলো নিয়ে আসা। এজন্য আমরা আরবি-উর্দু-ফার্সি-ইংরেজি ভাষা থেকে আমাদের উপযোগী গল্পগুলো সংগ্রহ করছি।

কোনও কোনও ভাই বলেছিলেন গল্পগুলোর সূত্র উল্লেখ করতে। সেটা একটা বিরক্তিকর কাজ ছাড়া আর কিছুই হতো না। আর সূত্র উল্লেখ করেও কোন লাভ হতো না। কারণ, আমরা তো হুবহু অনুবাদ করিনি। মূলের সাথে আমাদের গল্পের মূল ভাবটুকু ছাড়া আর কোনও মিল নেই। পাত্র-পাত্রী, গল্পের আঙ্গিক, গল্পের অবকাঠামো সবই নতুন। অনেক ক্ষেত্রে আমরা মূল গল্পটা থেকে শুধু অনুপ্রেরণাটুকু নিয়েছি। মূলের উপর ভিত্তি করে, আমরা নতুন আরেকটা গল্প তৈরি করেছি।

গল্পগুলো তৈরি করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি দিয়েছে, এই যে গল্পগুলো বানানো হচ্ছে, এটা কি মিথ্যা কথনের আওতায় পড়বে? আরো কয়েকজন ভাইও এই প্রশ্ন তুলেছেন। শিক্ষার জন্য কি মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয? আগে ফয়সালা হওয়া উচিত এভাবে গল্প বানানোটাকে মিথ্যাকথন বলা যাবে কিনা? আমার মনে হয়, এভাবে গল্প বানানোকে সরাসরি মিথ্যা কথন বলা ঠিক নয়। ইমাম গাযালী ও অন্যান্য বড় বড় বুযুর্গগণও তো এভাবে গল্প বলেছেন।

মাদরাসার সবার জানপ্রাণ মেহনত ছাড়া বইটা প্রকাশের মুখ দেখতো না। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সার্বিক তাওফীক দান করুন। আমীন

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ১২৫

ফেরেশতার কান্না

উপসাগরের পার্শ্ববর্তী কোন এক দেশে, একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে একটি মেয়ে পড়তো। মেয়েটি কুরআন কারীমকে খুবই ভালোবাসতো। সারাক্ষণই কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতো। তার ভ্যানিটি ব্যাগে সবসময় একটা ছোট কুরআন কারীম থাকতো। সুযোগ পেলেই তিলাওয়াত করতো। বাসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতো। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠেও কুরআন তিলাওয়াতে বসতো। তার তিলাওয়াতও ছিলো খুবই মিষ্টি-মধুর। পাষাণ হৃদয় ব্যক্তির মনটাও ভিজে উঠতো তিলাওয়াত শুনে। তার তিলাওয়াতে অভূতপূর্ব এক আকর্ষণ ছিলো।

এভাবে দিন কাটছিলো। একবার মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিলো। দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলো। কয়েকদিন পর মেয়েটা ইন্তিকাল করলো। দুঃখিনী মা শোকে পাথর হয়ে গেলেন। কিছুতেই সোনার টুকরো মেয়ের কথা ভুলতে পারছিলেন না। সুযোগ পেলেই মেয়ের কামরায় গিয়ে বসে থাকতেন। মেয়ের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে মেয়ের ছোঁয়া পেতে চাইতেন। ঘ্রাণ পেতে চাইতেন।

একদিন রাতে নিজের কামরায় ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। নিশি রাতেই মেয়ের কথা মনে হলো। উঠে মেয়ের কামরার দিকে গেলেন। কাছাকাছি যাওয়ার পর শুনলেন, কামরার ভেতর থেকে কিছু একটার আওয়াজ আসছে। কান্নার মিহি আওয়াজ। করুণ সুর। একজন দুজন নয়—অনেকের। মা ভয় পেয়ে গেলেন। কামরায় প্রবেশ করলেন না। সকালে ঘটনাটা পরিবারের সবাইকে বললেন। কেউ বিশ্বাস করলো না। সবাই সেই কামরায় গেলো। সেখানে কিছুই পেলো না। শ্বশুর বললেন,

—বৌমা এটা তোমার মনের ভুল।

পরের রাতেও একই ঘটনা। স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকেও কামরার কাছে নিয়ে শোনালেন। স্বামীও অবাক। পরদিন সকালে স্বামী-স্ত্রী মেয়ের কামরায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলো না।

স্বামী পাড়ার মসজিদে গেলেন। ইমাম সাহেবকে বিষয়টা খুলে বললেন। সব কথা শুনে ইমাম সাহেব বললেন,

–আজ আমি আপনাদের সাথে থাকবো। যাচাই করে দেখবো, বিষয়টা আসলে কী?

সবাই চুপচাপ আরেক কামরায় বসে আছেন। আজ কী ঘটে দেখার জন্য। রাত যখন একটা বাজলো, তখনই সেই করুণ, মিহি আর অপূর্ব কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। এমন সুর যে সবার কান্না পেয়ে গেলো। গা শিউরে উঠলো। রোম খাড়া হয়ে গেলো এই অপার্থিব আওয়াজ শুনে। ইমাম সাহেব কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন:

–আল্লাহু আকবার! এটাতো ফেরেশতাদের কান্নার আওয়াজ। ফেরেশতারা প্রতি রাতে এই সময়, মেয়েটার তিলাওয়াত শুনতে আসতো। মেয়েটা বোধহয় প্রতি রাতেই এই সময়ে তিলাওয়াত করতো। আর ফেরেশতারা তন্ময় হয়ে শুনতো। এখন সেই তিলাওয়াত শুনতে না পেয়ে ফেরেশতারা প্রতিদিন তার শোকে কাঁদতে আসে। সুবহানাল্লাহ!!

জীবন জাগার গল্প : ১২৬

পচা টমেটো

পঞ্চম শ্রেণি। পুরো ক্লাসের ছেলেরা দু'ভাগ হয়ে গেছে। কথা কাটাকাটি। রবারের গুলতি দিয়ে কাগজের টুকরা ছোঁড়াছুঁড়ি থেকে শুরু করে হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত গড়ালো বিষয়টা।

বিকেলে ছুটির ঘণ্টার পর, বাড়ি যাওয়ার পথে আরেক দফা মারামারি হলো। একজনের মাথা ফেটে গলগল করে রক্তও বের হলো।

ঘটনার শুরু হয়েছিলো গত বছর, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফল নিয়ে। ক্লাসের ছেলেরা দুভাগ হয়ে পড়েছিলো। সেই থেকে রেষারেষি আর দলাদলি।

পরদিন সবাই ভয়ে ভয়ে ইশকুলে এলো। কয়েকজন শাস্তির ভয়ে এমুখো হলো না। ছাত্রদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে ব্যবস্থা নিতে বললেন। কারণ বিষয়টা স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ছাত্রদের বাড়িতেও পৌঁছে গেছে।

স্কুলের পক্ষ থেকে রহমত স্যারকে দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনি বিষয়টা মীমাংসা করবেন।

স্যার ক্লাসে গেলেন। সবাই তো ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। একটাই ভরসা, রহমত স্যার ছাত্রদেরকে সহজে মারেন না। কিন্তু আজ বলা যায় না। বিষয়টা গুরুতর। অনেক ছাত্রের বাবা-মা পর্যন্ত এসে হেডস্যারের কাছে অভিযোগ করেছেন।

রহমত স্যার ক্লাসে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন,

–এসো আমরা একটা খেলা খেলি। সবাই তো বেজায় খুশি। যাক ফাঁড়া কাটলো বোধহয়। এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

–তোমরা সবাই আগামীকাল আসার সময় কিছু টমেটো নিয়ে আসবে।

পরদিন ক্লাসে স্যার বললেন,

–প্রত্যেকে নিজ নিজ টমেটোর উপর কিছু নাম লিখো। যাদেরকে অপছন্দ করো তাদের নামই শুধু লিখবে।

সবাই নাম লিখে টমেটো কালো করে ফেললো।

–স্যার, লিখেছি।

–এবার টমেটোগুলো যার যার ব্যাগে রেখে দাও।

–স্যার, খেলবো না?

–এটাই তো খেলা।

–এবার টমেটোগুলো কী করবো?

–ওগুলো এভাবেই থাকুক।

পরদিনও স্যার বললেন,

–টমেটোগুলো যার কাছে যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দাও। টমেটোগুলো সবসময় সাথেই রাখবে। বাড়ি গেলে পকেটে রাখবে।

দু'দিন না যেতেই টমেটোগুলো পচতে শুরু করলো। কারো কারো টমেটো থেকে পচা দুর্গন্ধও বের হতে লাগলো। কারো কারো কাছে একাধিক টমেটো ছিলো। তারা বেশ বিপাকে পড়লো।

এভাবে চারদিন পার হলো। পঞ্চম দিন স্যার জিজ্ঞেস করলেন,

–এই চারদিন কেমন কাটলো?

ছাত্ররা তাদের নানা সমস্যার কথা বললো। ব্যাগ নষ্ট হয়েছে, বইখাতা নষ্ট হয়েছে, টমেটোগুলো দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে, ইত্যাদি। স্যার বললেন,

–দেখো! তোমাদের ব্যাপারটাও এমনি। তোমরা সেই গত বছরের রাগ আর ঘৃণা মনে পুষে রেখেছিলে। সে রাগ আর ঘৃণা পচে গিয়ে তোমাদের পরস্পরে মারামারি হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ঠিক যেমনটা টমেটোগুলো পচে পরিবেশ দূষিত করেছে। তোমাদের রাগ-ঘৃণাও পুরো স্কুল আর গ্রামকে দূষিত করেছে। এই রাগ-ঘৃণা যতই ভেতরে পুষে রাখবে ততই পচতে থাকবে। তাই শুরুতেই এটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। যেমনটা আজ তোমরা টমেটোগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছো। তাহলেই মনের মধ্যে দূষণ সৃষ্টি হবে না।

জীবন জাগার গল্প : ১২৭

রাগ ও পেরেক

মিযান সাহেবের চাকরি হলো ঘুরে বেড়ানোর। কোম্পানির বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে অডিট করা। আল্লাহ তা'আলা তাকে তিন মেয়ের পর একটা ছেলে দিয়েছেন। তিনটা মেয়েই খুব ভালো। সবদিক দিয়েই ভালো। বিপত্তি বেধেছে ছেলেটাকে নিয়ে। বেজায় রাগী। পান থেকে চুন খসলেই সেরেছে। আর থামানো মুশকিল। পানির গ্লাস, কাচের প্লেট কিছুই অক্ষত থাকে না।

একটা মাত্র ছেলে। মারাও যায় না। মারলে মা থেকে শুরু করে দাদু পর্যন্ত সবাই রাগ করে। সবার মনোভাব,

–থাক না, এতটুকুন ছেলে! একটু-আধটু রাগ তো থাকবেই। ওসব কিছু নয়। বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে।

মিযান সাহেব ব্যাপারটাকে এতটা হালকাভাবে নিতে পারেন না। তিনি অনেকের সাথে পরামর্শ করলেন। শেষে একটা উপায় বের করলেন। একদিন ছুটির দিনে সুযোগ বুঝে ছেলেকে নিয়ে হাঁটতে বের হলেন। ছেলেকে আইসক্রিম কিনে দিলেন। সুন্দর দেখে একটা গাড়ি কিনে দিলেন। একথা সেকথার পর আসল কথায় আসলেন:

–আফীফ! বলো তো, রাগ করা কি ভালো?

–জি না, আব্বু। রাগ করা ভালো নয়।

–তাহলে কেন রাগ করো? এবার থেকে যখন তোমার রাগ আসবে তখন কি একটা কাজ করতে পারবে?

–কী কাজ আব্বু?

–এই নাও এক প্যাকেট পেরেক। আর এই ধরো, ছোট্ট হাতুড়ি।

–এগুলো দিয়ে কী করবো আব্বু?

– যখনই তোমার রাগ উঠবে, একটা দেয়ালে পেরেক ঠুকতে শুরু করবে। রাগ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবে।

এরপর যখনই আফীফের রাগ উঠতো, সে দেয়ালে পেরেক গাঁথতে শুরু করে দিতো। প্রথম প্রথম রাগ উঠলে দশটারও বেশি পেরেক গাঁথতে হতো। এরপর আস্তে আস্তে পেরেকের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, আফীফ কোনও সাহায্য ছাড়াই রাগ দমিয়ে ফেলতে পারছে। সবধরনের পরিস্থিতিতেই নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারছে।

আফীফ একদিন আব্বুকে গিয়ে বললো,

–আব্বু! আমি এখন কোনও পেরেক গাঁথা ছাড়াই রাগ দমন করতে পারি।

–তাই নাকি, দারুণ তো! এবার তোমার কাজ হলো এতদিন দেয়ালে যে পেরেকগুলো গেঁথেছো, সেগুলো তুলে ফেলা। এই নাও যন্ত্র।

আফীফ অনেক সময় লাগিয়ে, এক এক করে সবগুলো পেরেক তুলে ফেললো।

–আব্বু! পেরেকগুলো তুলে ফেলেছি।

–আচ্ছা! তাই নাকি? চলো দেখি। এবার কয়েকটা বিষয় লক্ষ করো।

এক. পুরো দেয়ালটা ঝাঁঝরা হয়ে আছে। শুধু ছিদ্র আর ছিদ্র। তোমার রাগটাও পেরেকের মতো। পেরেক যেমন দেয়ালকে ছিদ্র করেছে তোমার রাগটাও আশেপাশের মানুষের মনে ছিদ্র সৃষ্টি করেছে। জখম করেছে।

দুই. দেয়ালের এই দাগ আর কিছুতেই মুছবে না। মনের ক্ষতগুলোও তুমি চাইলেও মুছতে পারবে না।

তিন. তুমি চাইলে দেয়ালটা প্লাস্টার করতে পারবে। তাতে ছিদ্রগুলো ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে ছিদ্রগুলো ঠিকই রয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প : ১২৮

জীবনের প্রতিধ্বনি

বাপ-বেটা ঘরে ফিরছে। অনেক দূরের পথ। সেই কাকডাকা ভোরে রওনা দিয়েছে। গাড়ি বন্ধ থাকায় বনের পথটাকেই বেছে নিতে হলো। এ পথে গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছা যাবে। ছেলেটা হাঁটতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে। তাকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখতে হচ্ছে।

সুখের কথা হলো মাথার উপর প্রখর গনগনে সূর্য থাকলেও রোদ গায়ে লাগছে না। গাছের পাতা ভেদ করে আসতে পারছে না।

দুশ্চিন্তার কথা হলো সামনে পাহাড়ি পথ আছে। সেটা পাড়ি দেয়া একার পক্ষে সম্ভব হলেও ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে প্রায় দুঃসাধ্য।

দুই পাহাড়ের মোড়ে এসে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিলো। ছেলে বেজায় খুশি। সংকীর্ণ গিরিপথ। বাবার কাঁধে বসে চারদিকের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চলতে লাগলো। হঠাৎ ছেলেটা কাশি দিলো। তার কাশির মতো আরেকজনও কাশি দিয়ে উঠলো।

ছেলে বললো, কে?

উত্তরে আওয়াজ এলো, কে?

ছেলে বললো, এই দুষ্টু।

উত্তর এলো, এই দুষ্টু।

ছেলে রেগে গেলো। বাবাকে জিজ্ঞেস করলো,

আব্বু! কী হচ্ছে এসব?

–তুমি বোঝার চেষ্টা করো।

ছেলে এবার বললো,

–তুমি কোথায়? তুমি ভালো না।

উত্তর এলো, তুমি কোথায়? তুমি ভালো না।

ছেলে বললো, ঠিক আছে!

তুমি ভালো। তুমিই জিতেছো, এবার বের হয়ে এসো।

উত্তর এলো,

–ঠিক আছে! তুমি ভালো। তুমিই জিতেছো, এবার বের হয়ে এসো।

ছেলে কিছু বুঝতে না পেরে বাবাকে জিজ্ঞেস করলো।

–আব্বু! ব্যাপারটা কি?

–এটাকে বলে প্রতিধ্বনি। দুই পাহাড়ের সাথে মুখের আওয়াজ ধাক্কা খেয়ে তোমার আওয়াজ তোমার কাছেই ফিরে আসছে। তুমি যা বলবে সেটাও তাই বলবে। এই প্রতিধ্বনিটাই মূলত তোমার জীবন। তুমি যা করবে জীবনও তোমাকে ঠিক তাই ফিরিয়ে দেবে। তুমি যদি অন্যের কাছ থেকে ভালো কিছুর আশা করো তাহলে তাকেও ভালো কিছু দাও। তোমার জীবনের কাছ থেকে তুমি যদি ভালো কিছু আশা করো তাহলে জীবনকেও ভালো কিছু দাও।

জীবন জাগার গল্প : ১২৯

"জানতাম তুমি আসবে"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। একদল জার্মান সৈন্য শত্রুদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে গেলো। অনেক চেষ্টা করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সবাই ঘেরাও (অ্যামবুশ) থেকে বেরিয়ে গেলো। শুধু দুইজন ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়ে গেলো। তারা পুরো দলের নিরাপদ প্রস্থানের জন্য কাভারিং ফায়ার করে যেতে লাগলো।

এই দুজনের ত্যাগের বিনিময়ে, প্লাটুনের সবাই নিরাপদ স্থানের দিকে পশ্চাদপসারণ করতে সক্ষম হলো।

নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পর, কমান্ডিং অফিসার ওয়ারল্যাসে যোগাযোগ করলো, আটকে পড়া দুই সৈনিকের সাথে।

–হ্যালো হাইন! শুনতে পাচ্ছো?

–জি, স্যার শুনতে পাচ্ছি।

–আমরা এখান থেকে তোমাদেরকে কাভার দিচ্ছি তোমরা ক্রল করে পেছাতে থাকো।

–জি, স্যার।

ওরা দুজন –হাইন আর জিম– আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করলো। একটু আড়ালে এসেই দৌড় দিল। কিছুদূর যাওয়ার পর হাইন খেয়াল করলো তার সাথে জিম আসেনি। ততক্ষণে হাইন অন্যদের কাছে পৌছে গেছে। তার ক্ষতস্থানে ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। কিছুটা সুস্থবোধ করার পর হাইন কমান্ডিং অফিসারকে বললো,

–স্যার, আমি জিমকে আনতে যেতে চাই।

–তোমার গিয়ে লাভ নেই। সে জীবিত থাকলে নিজেই চলে আসতো। তুমি তাকে আনতে গিয়ে শুধু শুধু নিজেকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে।

–তবুও স্যার, আমি যাবো।

হাইন দৌড়ে ট্রেঞ্চ পার হলো। যেতে যেতে প্রায় ফ্রন্টলাইনের কাছাকাছি চলে গেলো। আরো কিছুদূর এগিয়ে দেখলো, জিম উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে পুরো শরীর ভেজা। হাইন প্রায় অলৌকিকভাবে জিমকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলো। যত্ন করে ট্রেঞ্চে শুইয়ে দিলো।

অফিসার অচেতন জিমকে পরীক্ষা করে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন,

–আমি তো আগেই বলেছি! কোনও লাভ হবে না। তোমার বন্ধুটি মারা গেগছে। তুমিও শুধু শুধু আবার গুলি খেয়েছো।

–আমার যাওয়াটা অর্থহীন ছিলো না, স্যার।

–কিভাবে? তোমার বন্ধু তো মারা গেছে।

–জি স্যার, আমি যখন তার কাছে পৌছলাম, সে তখনো জীবিত ছিলো। তার শেষ কথাটা আমাকে বাকি জীবন প্রেরণা যোগাবে।

–সে কী বলেছে।

–"হাইন! আমি জানতাম তুমি আসবে।"

জীবন জাগার গল্প : ১৩০

নগদ আর বাকি

ট্রেনে জানালার পাশে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। সেদিনের বণিকবার্তা পড়ছেন। টিটি সবুজ পতাকা নাড়ছেন। ট্রেন ছাড়ার ভেঁপুও বেজে গেছে। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এক যুবক এসে ভদ্রলোকের পাশে এসে বসলো।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ক্রমশ গতি বাড়ছে। যুবক বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। ভদ্রলোক পত্রিকা ভাঁজ করে যুবকটির দিকে ফিরে কুশল বিনিময় করলেন। যুবকটির মনমরা ভাব দেখে কী হয়েছে জানতে চাইলেন। যুবকটি সামান্য ইতস্তত করে কথা বলতে শুরু করলো।

–আমি বিবাহিত। আমাদের পাঁচ বছরের একটা মেয়েও আছে। আমাদের সুখের সংসার ছিলো।

–তার মানে বলতে চাইছো এখন আর তোমাদের সংসারে সুখ নেই।

–জি না।

–কেন?

–আমি একটা ব্যাংকে চাকরি করি। বেশ সম্মানজনক পদে। এক বছর আগে, একটা মেয়ে আমার সেকশনে যোগ দেয়। কাজেকর্মে ও বিভিন্ন অফিসিয়াল রুটিনে দুজনকে একসাথে কাজ করতে হয়। এভাবে আস্তে আস্তে দুজনের মাঝে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে।

–এখন তুমি কী করতে চাও?

–বউকে তালাক দেয়ার কথা ভাবছি। এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। এখন বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে দুজনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবো। স্ত্রীর সাথে আমার সাত বছরের দাম্পত্য জীবন। ভীষণ দোটানার মধ্যে আছি। দুজনের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নেয়া সত্যিই কঠিন।

–তোমার মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলছে সেটাই স্বাভাবিক। যদি চাও, তোমার সমস্যাটাকে আমরা অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

–কিভাবে?

–ধরা যাক, তোমার কর্মতৎপরতার কারণে ব্যাংকের গ্রাহক অনেকগুণে বেড়ে গেল। বিভিন্ন খাতে উন্নতি দেখা দিলো। কর্তাব্যক্তিরা খুশি হয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাইলো। তোমাকে বলা হলো,

–দুটি পুরস্কারের কোনও একটা বেছে নিতে।

পুরস্কার দুটি হচ্ছে,

–তোমাকে নগদ দুই লাখ টাকা দেয়া হবে; অথবা দুই বছর পর তোমাকে তিন লাখ টাকা দেয়া হবে।

–তুমি কোনটা নেবে?

–আমি অবশ্যই নগদটা নেবো।

–কেন?

–কারণ, ভবিষ্যত অনিশ্চিত। দুই বছর পর কত কীই তো ঘটে যেতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে। ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়তে পারে। আর দু'বছর পর বর্তমান কর্তারা থাকবেন কিনা সে নিশ্চয়তাও নেই। দুই বছর পর টাকার মূল্যমানও হ্রাস পেতে পারে।

–ঠিক বলেছো। ভবিষ্যতের টাকার চাইতে বর্তমানে টাকার মূল্য অনেক বেশি। ঠিক তেমনি ভবিষ্যতের সুখের চাইতে বর্তমানের সুখের মূল্য অনেক বেশি। ভবিষ্যত সবসময় অনিশ্চিত। কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো এই মেয়েটি তোমাকে আর পছন্দ করবে না। অথচ তোমার স্ত্রী আজ সাত বছর পরও তোমাকে আগের মতোই ভালোবাসে। পছন্দ করে। তাই তোমার উচিত বর্তমানের উপর ভরসা করা। বর্তমানের সুখকে আঁকড়ে ধরা। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সুখের আশায় বর্তমানের নিশ্চিত সুখ ত্যাগ না করা। আরেকটা বিষয়, তোমার বান্ধবী নিশ্চয় কুমারী?

–জি।

–দেখো, তোমার বান্ধবী চাইলে খুবই ভালো বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার সংসারে সাতটা বছর থাকার পর, তার আর ভালো বিয়ে হবে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই।

–বুঝতে পেরেছি। আপনার এই সুচিন্তিত পরামর্শে আমার অনেক উপকার হলো। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল থেকে বেঁচে গেছি।

জীবন জাগার গল্প : ১৩১

সদকা-চিকিৎসা

হুরাইমালা। রিয়াদের পার্শ্ববর্তী এক ছোট্ট শহর। এখানে একজন নারী ক্যান্সারে আক্রান্ত হলো। (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন)। মহিলার দেখাশোনার জন্য একজন পরিচারিকা রাখা হলো। পরিচারিকাটি ছিলো ইন্দোনেশিয়ান। অত্যন্ত ধার্মিক এক মহিলা।

কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন অসুস্থ মহিলাটি লক্ষ করলো, পরিচারিকাটি দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার হাম্মামে (বাথরুমে) যায়। আর একবার গেলে অনেকক্ষণ পর বের হয়ে আসে।

মহিলাটি পরিচারিকাকে কারণ জিজ্ঞেস করলো।

–তুমি হাম্মামে এতক্ষণ কী করো? আর এতবারই বা কেন যাও?

–আপনাকে তাহলে সব খুলেই বলতে হবে। আমি ভিসার আবেদন করেছিলাম দু'বছর আগে। কিন্তু বিশদিন আগে হঠাৎ করে আমার ভিসা লেগে গেল। আমার কোলে তখন উনিশ দিন বয়সী সন্তান। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম, এখন কী করি? আর্থিক সংকটে সংসার অচল হওয়ার উপক্রম। স্বামী মারা গিয়েছেন। আম্মা-আব্বা বললেন, কী আর করা, তুমি চলে যাও। ছেলে তার নানীর কাছে থাকবে।

আমি বুকে পাথর বেঁধে চলে এলাম। এখন তো আমার সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময়। কতক্ষণ পরপরই বুকে দুধ এসে জমা হয়। ব্যথায় টনটন করে। এজন্যই আমাকে কতক্ষণ পরপর হাম্মামে যেতে হয়। ব্যথা উপশমের ব্যবস্থা করতে হয়।

মনিবনী অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। পরিচারিকাকে দুই বছরের অগ্রিম বেতন, বিমান ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচসহ আরো কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলো। টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বললো, কাজ শেষ হলে ফিরে এসো।

মনিব মহিলাকে রুটিন চেকআপের জন্য কয়দিন পরপরই হাসপাতালে যেতে হয়। এবারও গেলেন। এ ঘটনার কয়েকদিন পর। ডাক্তার প্রথমে

রক্ত পরীক্ষা করলেন। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। রক্তে ক্যান্সারের কোন উপসর্গ নেই। এক্সরে করালেন। এখানেও সব ঠিক আছে। আরো কিছু পরীক্ষা করলেন। নাহ, কোথাও ক্যান্সারের কোন আলামত নেই। ডাক্তার মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন,

–আপনি কী চিকিৎসা করিয়েছেন?

মহিলা উত্তর দিলেন,

–সদকা-চিকিৎসা।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,

–সেটা আবার কেমন চিকিৎসা?

মহিলা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

–তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা করো ।

এরপর মনিব মহিলা ডাক্তারকে ইন্দোনেশিয়ান পরিচারিকার কথা খুলে বললো।

জীবন জাগার গল্প : ১৩২

মুরাবিত দুর্গে একদিন

মুরাবিতীন। ইসলামের সোনালী অধ্যায়ের সোনালি একটি জামাতের নাম। স্বপ্নীল এক অধ্যায়ের নাম। আব্বাসী খেলাফতকালে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক অপূর্ব ইসলামী আন্দোলনের নাম। সেই অঞ্চলের গল্প।

শায়খ হাসান আল হুসাইনী। বাহরাইনের বিখ্যাত দায়ী। ইসলাম-প্রচারক। তিনি একবার তিউনিশিয়া সফরে গেলেন।

সে দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দাওয়াতি কাজ করলেন। পাশাপাশি মুরাবিতদের বিভিন্ন কিল্লা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এমন একটি কিল্লা পরিদর্শনের কথা তিনি তুলে ধরেছেন,

–আমরা গেলাম সুসাহ শহরের একটি দুর্গে। এটি নির্মিত হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় শতকে। এই দুর্গ থেকেই সিসিলিসহ আরো বহু দ্বীপে ইসলামী বিজয়াভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো।

কিন্তু কালের আবর্তনে সে'দিনের ইসলামের পতাকাবাহী বিশাল এই দুর্গের একটি অংশ আজ 'গণিকালয়ে' পরিণত হয়েছে। তিউনিশিয়ার স্বৈরশাসক বেন আলির ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতার কারণেই এমনটা হয়েছে।

আমরা দুর্গের অন্যান্য অংশ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। একজন বলল,

–শায়খ! আপনি কি ওপাশের গণিকালয়টাও দেখতে চান?

আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি দাওয়াতের নিয়তে গিয়ে ওখানের মেয়েগুলোকে দ্বীনের কিছু কথা শোনাতে পারি মন্দ কী?

তাই বললাম, জি!

–দেখতে চাই।

আমি কিছু আতর কিনলাম। ও-পাড়ার বাসিন্দাদেরকে হাদিয়া হিসেবে দেবো।

আমি মনে মনে ইস্তিগফার পড়তে লাগলাম। ভেতরে গেলাম। ভেতরে দেখলাম নানা বয়সী মেয়েরা ঘোরাফেরা করছে। যে যার কাজে ব্যস্ত। একজনের সাথে কথা বলতে চাইলাম। মহিলাটা সোজা বলে দিলো,

–কোনও ওয়াজ-নসীহত শুনতে চাই না। অন্য কোনও কাজ থাকলে বলো। তোমরা উপসাগরের অধিবাসী। তোমাদের তেলবেচা টাকা আছে। আমাদের দুঃখকষ্ট তোমরা বুঝবে না।

মহিলা নিষেধ করলেও আমি বললাম,

–তুমি টাকা-পয়সার কথা তুললে, তাই জিজ্ঞেস করছি; টাকা-পয়সার মূল মালিক কে?

–আল্লাহ।

–কে সবকিছু দান করেন?

–আল্লাহ।

আমাদের কথাবার্তার এই পর্যায়ে অন্যান্য মেয়েরাও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো। আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম। আল্লাহ তা'আলা একটা পিঁপড়ার রিযিকের কথাও মনে রাখেন। একটা মৌমাছির খাবারের কথাও মনে রাখেন। পাখিদের কথাও ভুলে যান না। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের

রিযিকের কথা আল্লাহ ভুলে যাবেন এটা কি সম্ভব?

–জি না, সম্ভব নয়।

–আর বলো দেখি তোমরা, ক্ষুধার যন্ত্রণা আর আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা কোনটা সহ্য করা অসম্ভব?

–আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা।

–কিন্তু তোমাদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমরা ক্ষুধার যন্ত্রণাকেই অসহ্য মনে করছো। দোযখের আগুনের কথা ভুলেই গেছো।

এরপর আমি তাদেরকে ব্যভিচারের শাস্তি কী, সেটা বললাম। ইসলামের বিভিন্ন সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরলাম। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাপরায়ণতার কথাও বললাম।

তারা সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। বললো,

–আমরা এই পাপের জীবন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আল্লাহু আকবার।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, এত সহজেই তারা হিদায়াতের পথে আসতে রাজি হয়ে যাবে।

–তোমরা কি আল্লাহর নামে শপথ করতে পারবে যে, এ কাজ আর কখনো করবে না। বাকি জীবন হালালের সীমায় থেকেই কাটিয়ে দেবে?

–জি, আমরা আল্লাহর কাছে খাস দিলে তাওবা করছি। আর অঙ্গীকার করছি, এমন কাজে আর জড়াবো না।

–আমি তোমাদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ। তোমরা আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকো। তিউনিশিয়ার মুসলিম বোনেরা এমন কাজ করবে, আরবের মুসলিম ভাইয়েরা মেনে নেবে না। তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমাদের কল্যাণ চায়।

প্রিয় বোনেরা! তোমরা এমন দেশের অধিবাসী, যে দেশকে জয় করার জন্য মদীনা থেকে রাসূলের সাহাবীগণ ছুটে এসেছেন। এ পবিত্র ভূমিতে এসেছেন ইবনুয যুবাইর, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, হাসান -হুসাইন, ইবনে জা'ফর, ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

আমার মুখে সাহাবায়ে কিরামের কথা শুনে, এদেশে তাদের পুণ্যময় আগমন ঘটেছে শুনে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ভেতরে কিছু যুবকও ছিলো, তারাও আমার কথা শুনে অবনত দৃষ্টিতে বিভিন্ন খুপড়ি থেকে বের হয়ে এলো। তারাও শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো।

আমি তাদেরকে কান্না থামাতে বললাম। ওজু-গোসল সেরে আসতে বললাম। সবাইকে একটা ঘরে বসিয়ে বললাম,

–আমি এখন দু'আ করবো। তোমরা সবাই আমীন বলবে।

তাদের সবার জন্য হালাল রিযিকের দু'আ করলাম। নিরাপত্তার জন্য দু'আ করলাম। ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য দু'আ করলাম।

একজন বললো,

–আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আমরা এমন কথা এই প্রথম শুনলাম। আগে কেউ আমাদেরকে এত সুন্দর কথা শোনায়নি। সবাই আমাদেরকে ঘৃণা আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো।

আরেকজন বললো,

–আমরা আর কোনও রকমের হারাম কাজ করতে চাই না। এসব কিছুই হয়েছে বেন আলির দুঃশাসনের জন্য। সে দেশটাকে ইউরোপ বানাতে চেয়েছিলো। সেক্যুলার রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিলো।

একজন বললো,

–আমার তিনটা সন্তান আছে। আমাকে হারাম থেকে বাঁচান। আমার জন্য একটা হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিন।

একজন বললো,

–এখানে থাকলেও আমি সবসময় মনে মনে কাঁদতাম। প্রতিদিন রাতে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলতাম। মনে মনে বলতাম এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে কিভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো? কী জবাব দেবো?

এ কথা শুনে সবাই তো কাঁদলো, আমারও কান্না পেয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৩

আমিও পারি

সুলতান স্যার। নরমে আর গরমে মেশানো এক ব্যক্তিত্ব। খুব যত্ন করে পড়ান। নানাভাবে ছাত্রদেরকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন।

ছাত্ররা তাকে ভয়ও করে আবার ভালোওবাসে। ভয় আর ভালোবাসা একসাথে খুব কম শিক্ষকই অর্জন করতে পারেন। বিজ্ঞান পড়ান।

দশম শ্রেণি। আজকের বিষয় সালোকসংশ্লেষণ।

স্যার পড়া নিচ্ছেন। সালাম! দাঁড়াও। পড়া বলো। সালাম পড়া বলতে শুরু করলো। স্যার উত্তরের মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন:

–উঁহু, তোমার উত্তর হচ্ছে না। ঠিক করে বলো।

আর কিছু না বলে, থমকে গেলো। স্যার এবার বললেন,

–আবিদ! দাঁড়াও। পড়া বলো। আবিদ পড়া বলতে শুরু করলো। তাকেও স্যার মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। নাহ তোমারও হচ্ছে না। ঠিক করে বলো। আবিদ থমকে গেলো। তবে চুপ না করে আবার শুরু থেকে পড়া বলতে আরম্ভ করলো। এভাবে পড়া বলা শেষ করলো।

স্যার বললেন,

–হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি পেরেছো।

সালাম হাত তুললো।

–কী সালাম তুমি কিছু বলবে?

–জি স্যার।

–বলো।

স্যার, আমিও তো আবিদের মতোই হুবহু একই পড়া বলেছি। আমাকে কেন থামিয়ে দিয়েছিলেন?

–দেখো, আমি কিন্তু আবিদকেও থামিয়ে দিয়েছিলাম। তবে আমি থামালেও সে থামেনি। চালিয়ে গেছে। কোনও বাধাই সে মানেনি। তার আত্মবিশ্বাস ছিলো, সে যা বলছে, ঠিক বলছে। সে যা করছে, ঠিক আছে। যত বাধাই আসুক সে টলেনি।

পক্ষান্তরে, তুমি ধাক্কা আসার পরই টলে গেলে। সামান্য ঝাপটাতেই নুয়ে পড়লে। নেতিয়ে গেলে। নিজের ব্যাপারে তুমি শতভাগ নিশ্চিত ছিলে না। যেমনটা ছিলো আবিদ।

দেখো! অন্যের কথামতো থেমে যাওয়া মানে হলো নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। তুমি জীবনে অসংখ্যবার শুনবে,

–না, তুমি পারবে না। না, তোমারটা হচ্ছে না। তুমি কিছুই হতে পারবে না। তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি কোনও কাজের নও।

এসব কথায় একদম কান দেবে না। তুমি তোমারটা করে যাবে। তুমি পারবে।

মনে মনে সবসময় জপবে:

–আমিও পারি। আল হামদুলিল্লাহ

জীবন জাগার গল্প : ১৩৪

চাকরি বাঁচানোর কৌশল

অফিসের কর্তাব্যক্তি তার তিন সহকর্মীকে প্রশ্ন করলেন:

–বলুন তো ২+২ = ৫ ঠিক আছে?

প্রথম সহকর্মী:

–জি, স্যার পুরোপুরি ঠিক আছে।

দ্বিতীয় সহকর্মী:

–জি, স্যার ঠিক আছে, যদি আমরা আরেকটা এক যোগ করে নেই।

তৃতীয় সহকর্মী:

–না স্যার, এটা ভুল। দুয়ে দুয়ে পাঁচ নয় হবে চার।

পরদিন অফিসে তৃতীয় সহকর্মীকে দেখা গেলো না। অনুসন্ধান করে জানা গেলো, কোম্পানি আর সেই সহকর্মীর প্রয়োজন বোধ করছে না। তাকে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে।

অফিসের সহকারী প্রধান বিস্মিত হলো। কর্তাকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, কেন তাকে ছাঁটাই করা হলো?

বস বললেন,

–গতকাল যা ঘটলো, সেখানে তিনজনের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখো।

প্রথম ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। সে নিজেও জানে যে সে একজন মিথ্যাবাদী। (এ ধরনের লোককে কর্তারা পছন্দ করে। কারণ তারা তাল মিলিয়ে চলতে পারে।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি মেধাবী। সে নিজেও জানে যে সে একজন মেধাবী। তবে তাকে যা সন্তুষ্ট করে না বা যা তার পছন্দ নয় সেটা সে গোপন রাখে। (এ ধরনের লোকও কর্তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, কারণ এরা ঝামেলা পাকায় না)।

তৃতীয় ব্যক্তি সত্যবাদী। আর সে নিজেও জানে যে সে সত্যবাদী। যা তার পছন্দ নয়, সেটা সে প্রকাশ করে দেয়। (এ ধরনের লোক ক্লান্তিকর। এদের নিয়ে কাজ করা কঠিন। কর্তাদের জন্য এরা বিপদ ডেকে আনতে ওস্তাদ।)

এরপর কর্তা সহকারীকে প্রশ্ন করলেন, তুমিও বলো দেখি ২+২= ৫ ঠিক আছে?

সহকারী: আমি তো আপনার কথা শুনলাম। কিন্তু আমি এর ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। আমার মতো একজন অজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মতো মহাজ্ঞানীর কথা ব্যাখ্যা করার কি যোগ্যতা রাখে? না ব্যাখ্যা করা উচিত।

–তোমার মতো মানুষরা হলো মুনাফিক (চাটুকার)। এ ধরনের মানুষও কর্তাদের প্রিয় হয়।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৫

জীবন ও লবণ

ফাহীমের আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ হয়েছে কয়েক বছর হয়ে গেলো। বিয়ে থা করে এখন সংসারী। ছোটখাটো একটা ব্যবসার সাথে জড়িত।

শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেলেও শিক্ষকগণের সাথে আগের মতোই সুসম্পর্ক অটুট আছে। নিয়মিত যোগাযোগ আছে। বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে পরামর্শের জন্যও তাদের কাছে যাওয়া হয়।

গত কিছুদিন যাবৎ ব্যবসার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে ইদানীং ঘরে থাকতেও ভালো লাগে না। মনটা সবসময় খারাপ থাকে। রাতে ঘুম হয় না। হতাশা চারদিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

এ অবস্থায় কী করা যায়– পরামর্শের জন্য শিক্ষকের কাছে এলো। সবকিছু খুলে বললো।

শিক্ষকঃ একমুঠো লবণ নাও, তারপর এক গ্লাস পানিতে লবণটা মিশিয়ে ফেলো।

ফাহীমঃ জি, মিশিয়েছি।

–পানিটুকু পান করো।

–জি, একটু পান করেছি।

–কেমন লাগলো?

–অত্যন্ত নোনা।

–চলো, এবার নদীর তীর থেকে একটু বেড়িয়ে আসি। এই নাও লবণের বাটিটাও সাথে রাখো।

লবণটুকু নদীর পানিতে ফেলো। এবার এক আঁজলা পানি চুমুক দিয়ে দেখো তো!

কেমন লাগলো, পানিতে কোনও লবণাক্ততা আছে?

–জি না।

–দেখো! ফাহীম, জীবনের যন্ত্রণাগুলোও ঠিক লবণের মতো। খুব একটা পার্থক্য নেই।

মানুষের জীবনে যন্ত্রণা সবসময় -বেশি আর কম- থাকেই। কিন্তু সেই যন্ত্রণা আমরা কতটা সহ্য করতে পারবো সেটা নির্ভর করে আমাদের ভেতরের 'পাত্রের' উপর। সহ্যশক্তির উপর।

যখনই আমরা কোনও যন্ত্রণা অনুভব করবো, আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ভেতরের পাত্রটাকে বড়ো করে নেব। সহ্যশক্তিটাকে বাড়িয়ে নেব।

দেখো, লবণ কিন্তু সেই একমুঠোই ছিলো। গ্লাসের পানিতে মেশানোর পর পানিটা মুখেই দিতে পারোনি। ছোট পাত্রের সামান্য পানি লবণটুকু হজম করতে পারেনি। লবণটাই বরং গ্লাসের পানিটাকে হজম করে ফেলেছে।

অন্যদিকে নদীর পানিতে একই পরিমাণ লবণ ফেলার পর, লবণটা নাই হয়ে গেছে।

তুমি গ্লাসের মতো হয়ো না। নদীর মতো হও।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৬

দুই গাধার কাণ্ড

এক কৃষকের দুইটা গাধা ছিলো। গাধা দুটির মাঝে সারাক্ষণ খিটিমিটি লেগেই থাকতো। একটার ভালো আরেকটা সইতে পারতো না।

একদিন কৃষক দুই গাধাকে নিয়ে বাজারে রওয়ানা দিলো। যাওয়ার সময় এক গাধার পিঠে চাপালো লবণের একটা বস্তা। আরেক গাধার পিঠে হাঁড়িপাতিলের বস্তা।

গ্রামের বাজার। বাড়ি থেকে অনেক দূরে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, নদী পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে বাজারে পৌঁছতে হয়।

অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়ার পর লবণবাহী গাধা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হাঁড়িকুরিবাহী গাধা তো ফুরফুরে মেজাজে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে টগবগ করে এগিয়ে যাচ্ছে। বেজায় খুশি। দিল তার বেশ খোশ। তার সঙ্গীর পিঠে পেল্লায় এক বোঝা চেপেছে। তার পিঠে তো হাঁড়িপাতিল। বোঝাটা দেখতে বড়সড় হলেও ওজন তেমন নেই। খালি ডেগের ভার আর কতটুকুই বা হবে?

লবণবাহী গাধা রোদের তীব্রতায়, বোঝার প্রচণ্ড ভারে নুয়ে পড়ছে। জিহ্বা বের হয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে পথ চলছে।

গাধাটা ভাবলো, সামনে নদী আসছে। শীতল পানিতে একটা ডুব মেরে নিতে পারলে রোদের কষ্ট অনেকটা কেটে যাবে।

নদীর মাঝ বরাবর গিয়ে ঝপাস করে ডুব দিলো। বেশ কিছুক্ষণ ডুব দিয়ে পানির নিচে থাকলো। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো। এখন শরীরটা অনেক হালকা আর ঝরঝরে লাগছে। পিঠের বোঝাটাও এখন ভারী লাগছে না। মনে হচ্ছে পিঠে কোনো বোঝাই নেই।

লবণ-গাধার দেখাদেখি ডেগ-গাধাও পানিতে ডুব দিলো। অবাক কাণ্ড, পিঠের বোঝাটার ওজন যেনো আগের তুলনায় হাজার গুণ বেড়ে গেছে। পিঠ ভেঙে যেতে চাচ্ছে। পা দুটো সামনে চলছে না। টলোমলো পায়ে এগিয়ে চললো।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৭

আল্লাহর ব্যবসা

রাজা দরবারে বসে আছেন। ন্যায়পরায়ণতায় তার সুখ্যাতি আশেপাশের আরো দশটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

দরবার চলছে। এক মহিলা এসে বললো,

–আমি জানতে চাই, আল্লাহ জুলুমকারী নাকি ন্যায়বিচারক?

–নাউযুবিল্লাহ! মুখ সামলে কথা বলো। আল্লাহ সবসময়ই ন্যায়পরায়ণ। কখনো কারও ওপর জুলুম করেন না। তোমার ঘটনা কি খুলে বলো তো?

-আমার স্বামী মারা গিয়েছেন। ঘরে ছোট ছোট চারটা মেয়ে। আমি ঘরে সুতা পাকিয়ে কাপড় বুনি। সেগুলো বাজারে বিক্রি করে খেয়ে-পরে বাঁচি। গতকাল বিকেলে, কিছু বোনা সুতা আর কাপড় নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় কিছু পাখি এসে আমার মাথার ঝাঁকা থেকে সুতো আর কাপড়গুলো ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

ঘরে কোনও খাবার নেই। আজও কোন ব্যবস্থা না হলে ছোট ছোট মেয়েগুলো না খেয়ে থাকবে।

এমন সময় দরবারে একদল ব্যবসায়ী প্রবেশ করলো। তারা বললো,

–জাঁহাপনা! আমরা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার শাহী খাজানায় দান করতে চাই। আপনি রাজ্যের উপযুক্ত দরিদ্রদের মাঝে তা বিলিয়ে দেবেন।

–এত টাকা দান করছো কেন?

–গতকাল বিকেলের দিকে আমরা মাঝসমুদ্রে ছিলাম। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় আসলো। ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের পণ্যবাহী জাহাজ মোচার খোলের মতো দুলতে লাগলো। একপর্যায়ে জাহাজে ফুটো দেখা দিলো। ফুটোগুলো বন্ধ করা যায় এমন কিছু আমাদের কাছে ছিলো না।

এমন সময় দিগন্ত থেকে একঝাঁক পাখি এলো। সেগুলো জাহাজের উপর কিছু কাপড়ের টুকরা আর সুতার বাণ্ডিল ফেলল। সেগুলো দিয়ে জাহাজের ফুটো বন্ধ করলাম। আমরা সবাই মিলে নিয়ত করেছি আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সদকা করবো।

–৩

রাজা মহিলাটির দিকে ফিরে বললেন,

–আল্লাহ তোমার জন্য স্থলে-জলে সব জায়গায় ব্যবসা করছেন, আর তুমি কিনা তাঁকে জালিম আর অবিবেচক বলছো।

ধরো, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। মেয়েদেরকে ভালোভাবে লালনপালন করো।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৮

মায়ের পদতল

লাবীব ভালো ছেলে। বিদেশী এক কোম্পানিতে এই কয়েক মাস হলো যোগ দিয়েছে। কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরই পিতার ইন্তিকাল হয়েছে। সংসারে আছে আম্মু, সে আর ছোট বোন।

মা কঠোর সংগ্রাম করে ছেলেকে লেখাপড়া করিয়েছেন। দিনরাত সেলাই মেশিনের সাথে লেগে থেকেছেন। সারাদিন একটানা মেশিনের ঠকর ঠকর চলতো। শুধু ছেলেটা আর মেয়েটার মুখের দিকে চেয়েই তিনি একটা জীবন পার করে দিলেন।

সেদিন লাবীবের অফিসে কী একটা ঝামেলা হলো। বাসায় এসেও মন খারাপ। এমন সময় আম্মু এসে বিয়ের কথা তুললেন। মেজাজটা আগে থেকেই গরম হয়ে ছিলো। কোনও কারণ ছাড়াই মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেললো। খেপে গিয়ে টেবিলের খাতাপত্রও ছুঁড়ে ফেললো।

আম্মু অবাক হলেন। ছেলেটা আজ হঠাৎ এমন করছে কেন? এমন তো কখনো করেনি। কিছু না বলে চুপচাপ বের হয়ে গেলেন। বাসার পরিবেশ গুমোট হয়ে রইলো। লাবীবের মুখ ভার দেখে আম্মুও বড় একটা ঘাঁটালেন না। রাতের খাবারের সময়ও সবাই চুপচাপ খাবার সেরে যে যার মতো উঠে গেলো।

লাবীব দু-এক লোকমা নাকেমুখে গুঁজে শুয়ে পড়লো। আস্তে আস্তে রাগ পড়ে এলো। মনে মনে ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগলো। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে উঠে চোরের মতো লুকিয়ে অফিসে চলে গেলো। অফিসে বসে মায়ের কাছে মেসেজ পাঠালো।

–'শুনেছি মানুষের পায়ের পাতার নিচের অংশটা উপরের অংশের চেয়ে নরম আর কোমল। এটা সত্য কিনা যাচাই করে দেখতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার দুঠোঁট দিয়ে আপনার তলাটা ছুঁয়ে দেখবো'।

বিকেলে বাসায় ফিরে এলো লাবীব। আম্মু প্রতিদিনের মতো আজো গেইটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় ছিলেন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, তোমাকে আর পরীক্ষা করতে হবে না। তুমি যখন ছোট ছিলে, আমি তোমার পায়ের পাতার উপরে-নিচে অনেকবার চুমু খেয়ে দেখেছি। কথাটা সত্য।

জীবন জাগার গল্প : ১৩৯

বিস্কুটের প্যাকেট

শাহেদ সিলেট যাবে। টিকেট কেটে বসে আছে। ট্রেন ছাড়তে এখনো অনেক দেরি। পাশের বুকস্টল থেকে পছন্দের একটা বই কিনল। আর এক প্যাকেট বিস্কুটও কিনল। বইটার মলাট দেখেই মনে হলো ট্রেন সফরটা দারুণ জমবে। বইটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পড়া শুরু করে দিলো।

আগের আসনে বসে বইটার মধ্যে ডুবে গেলো। পাশে আরেকজন লোকও বসে বসে পত্রিকা পড়ছিলো।

শাহেদ বই পড়ছিলো আর পাশে খুলে রাখা প্যাকেট থেকে বিস্কুট মুখে দিচ্ছিলো। বিস্কুট নিতে গিয়ে হঠাৎ দেখলো পাশের লোকটাও প্যাকেট থেকে বিস্কুট নিয়ে খাচ্ছে। সে অবাক হলো। এ কেমন লোক! অন্যের বিস্কুট খাচ্ছে। একটু অনুমতিও চাইলো না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

শাহেদ আরেকটা বিস্কুট নিলো। এরপর দেখলো লোকটাও বিস্কুট নিলো। তার মনে হলো লোকটার মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে রাগ দমন করলো। একবার মনে হলো লোকটাকে কিছু বলবে। পরক্ষণেই ভাবলো থাক, দেখা যাক কী হয়।

এভাবে খেতে খেতে বিস্কুট রইলো আর একটা। সে দেখলো লোকটা বিস্কুট ভেঙে তার জন্য অর্ধেক রেখে বাকিটা খেয়ে ফেললো। সেও বাকি অর্ধেক খেলো।

ট্রেন এসে গেলো। বইটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দৌড় দিলো। নির্দিষ্ট আসনে বসল। বইটা নেয়ার জন্য ব্যাগ খুলে দেখে তার কেনা বিস্কুটের প্যাকেটটা ব্যাগের এক কোণে পড়ে আছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৪০

ক্ষুধা ও বদহজম

সাদিক রাতের বেলা দোকান বন্ধ করে বাসায় ফিরছিলো। চৌরাস্তায় এসে দেখলো একজন বৃদ্ধলোক শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। সাদিক জানতে চাইলো,

–কী হয়েছে আপনার? এমন করছেন কেন?

–বাজান! গতরাত থেকে কিছুই খেতে পাইনি। এখন মনে হচ্ছে, এভাবে থাকলে রাতটুকুও পার করতে পারবো না। প্রচণ্ড পেটব্যথায় মরে যাচ্ছি।

–এই নিন টাকা। কিছু খেয়ে নিন। আশা করি কিছু খেলে ব্যথা চলে যাবে।

সাদিকের আজ বন্ধু জাকিরের বাড়ি যাওয়ার কথা। ওর ছেলের আকীকা অনুষ্ঠান।

–কি রে ছেলের অনুষ্ঠান আর তুই শুয়ে আছিস?

–আর বলিস না। দুপুরে শ্যালকদের সাধাসাধিতে খাওয়ার পরিমাণটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিলো। এখন তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। পেটে সাংঘাতিক মোচড় দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ভেতরের সবকিছু বেরিয়ে আসবে।

সাদিক অবাক হয়ে ভাবলো, একজন না খেয়ে মরছে। আরেকজন বেশি খেয়ে মরছে।

এই বন্ধুটি যদি অতিরিক্ত খাবারটুকু গরিব লোকটাকে দিতো, তাহলে দুজনের কারোরই পেটব্যথা হতো না।

জীবন জাগার গল্প : ১৪১

ব্যাঙ-ব্যবচ্ছেদ

রায়িফ মেডিকেলে প্রথম বর্ষের ছাত্র। ইশকুল-জীবন থেকেই সে জীব বিজ্ঞানে ভালো। অন্যদের যেখানে ব্যাঙ-ব্যবচ্ছেদের কথা শুনলেই গা গোলাতো, সে নির্বিকার চিত্তে ব্যাঙ ধরে এনে কচকচ করে কেটে ফেলতো। ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। নিজের পছন্দের মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরে আনন্দিত।

আজ কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ছিলো। সেই সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছে। রায়িফ ব্যাঙটাকে কেটে আবার জোড়া লাগিয়ে দেখিয়েছিলো। অন্যরা তার মতো করে পারেনি। স্যারের পর্যন্ত তাক লেগে গিয়েছিলো।

পরীক্ষা শেষে বাড়িমুখো হলো। বাড়িতে বড় আপু আছে। নতুন ভাগনে হয়েছে। তাই আপা বেশ কিছুদিন থাকবেন। আপু থাকলে বাসাটা আনন্দে ভরপুর থাকে। সরগরম থাকে।

আজ আপুকে ব্যাঙের বিষয়টা দেখাতে হবে। আপু আবার এসব দেখতে পারে না। তার নাকি ঘেন্না লাগে। রায়িফ ঠিক করলো, আজ জোর করে হলেও আপুকে ব্যঙ-কাটা দেখাবে।

রায়িফ বাসায় এসে দেখলো ভাগ্নে ঘুমুচ্ছে। আপু গোসল করছে। তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেললো। ঘুমন্ত ভাগ্নেটাকে অন্য বিছানায় লুকিয়ে রাখল। তারপর বড়সড় একটা ব্যাঙ কেটে, লাল রঙ মাখিয়ে বিছানার ওপর রেখে দিলো।

রায়িফ আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখলো। আপু কী করে দেখবে। আপু গোসল সেরে এসে দেখলো বিছানায় ছোট্ট সোনাটা নেই। তার জায়গায় রক্তমাখা কিছু একটা পড়ে আছে। দৃশ্যটা দেখেই আপুর মুখ থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বের হলো। এরপর জ্ঞান হারিয়ে, মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

রায়িফ বুঝতে পারলো, সে কী জঘন্য কাজ করেছে। অতি দুষ্টুমি অনেক সময় চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে, এটা তার খেয়াল ছিলো না।

জীবন জাগার গল্প : ১৪২

জানালার কাচ

বিয়ের পর ফাহীমকে বউসহ কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতেই থাকতে হয়েছে। চাচার সংসারে থেকে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলাতেই মা-বাবা দুজনই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তারপর থেকেই চাচা-চাচীকেই সে মা-বাবা বলে জেনে এসেছে।

বিয়ের পর বউসহ আর চাচার ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূত হয়ে চাপতে ইচ্ছা হয়নি। তাই বিয়ের আগেই চাচাকে দিয়ে, শ্বশুরকে বলে রেখেছিলো, বিয়ের পর বছরখানেক সে বউ তুলে নিতে পারবে না। শ্বশুরও আপত্তি করেননি। শাশুড়ি তো বলতে গেলে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। একটামাত্র মেয়ে।

প্রথম দিকে অবশ্য রেহানা মৃদু আপত্তি তুলেছিলো। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর ঘরে চলে যায়। সে কি না এখনো নিজের ঘরে থাকছে। কিন্তু স্বামীর অপারগতা দেখে আর কথা বাড়ায়নি।

বছর না ঘুরতেই, সেদিন বড় সাহেব তার খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গেলেন। দুরু দুরু বুকে কর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কী না কী হয়েছে আল্লাহই জানেন। অফিসে তো কান ভাঙানি দেয়ার লোকের অভাব নেই।

–তো ফাহীম! দিনকাল কেমন কাটছে?

–জ্-জি স্যার, খুব ভালো ।

–গত মাসে কোরিয়ান ডেলিগেটসের সাথে করা ডিলটা আজ ফাইনাল হয়েছে। তোমার কর্ম-তৎপরতায় কোম্পানি খুশি। এই ডিলটার কারণে আমরা কোরিয়ার বাজারে ঢুকতে পারছি। কোম্পানি অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিলো। তোমার বুদ্ধিমত্তার কারণেই এবার তা সম্ভব হলো।

-কী যে বলেন স্যার, আমি তো আপনার দেখিয়ে দেয়া ছক ধরেই আলোচনা চালিয়ে গেছি।

–না সে ঠিক আছে, যাক কোম্পানি তোমাকে এ উপলক্ষে একটা প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুমি একটা বাসা পাবে। পাশাপাশি একটা গাড়ি।

ফাহীম নতুন বাসায় উঠলো। রেহানার আনন্দের শেষ নেই। একান্ত নিজের একটা সংসার হলো। মায়ের কাছে থেকে সংসারের কুটোটাও নাড়তে শেখেনি। এখন জান পানি হয়ে যাচ্ছে, কাজের ধাক্কায়। তবুও আনন্দ।

তাদের শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে, পাশের বাড়ির ছাদ দেখা যায়। রেহানা প্রতিদিনই অবাক হয়ে দেখে, ছাদে শুকোতে দেয়া কাপড়গুলো খুবই ময়লা হয়ে থাকে। ময়লা কাপড়গুলো কেন শুকোতে দেয়। ধোয়া কাপড় তো পরিষ্কার হওয়ার কথা?

সে প্রতিদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একদিন স্বামীকেও বিষয়টা বললো। কথাটা শুনে ফাহীম মুচকি হাসলো। কিছু বললো না।

–হাসছো যে?

–কেন হাসছি, আগামীকাল বলবো।

পরদিন রেহানা অবাক হয়ে বললো,

–এই দেখো দেখো! পাশের বাড়ির কাপড়গুলো আজ পরিষ্কার দেখাচ্ছে। যাক এতদিন পর ওরা কাপড় ধোয়া শিখলো।

–ওদের কাপড় এর আগেও ঠিক ছিলো। তুমি দেখতে ভুল করেছিলে।

–কিভাবে?

–আজ সকালে আমাদের জানালার কাচগুলো পরিষ্কার করেছি। তুমি এতদিন যা ময়লা দেখছিলে, সেটা ওদের কাপড়ের ময়লা ছিলো না। ছিলো আমাদের কাচের ময়লা।

দেখো রেহানা! জীবনেও বহুক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছুই আবছা দৃষ্টি দিয়ে দেখি। তাই বলেই এত বিপত্তি, এত সমস্যা, বুঝলে!

জীবন জাগার গল্প : ১৪৩

শুঁটকির গন্ধ

মুন্সির হাট। জমজমাট এক বাজার। প্রতি মঙ্গলবারে এই হাট বসে। খোকন মিয়া এই বাজারে শুঁটকির ব্যবসা করে। তাদের দুই পুরুষের সামান্য ব্যবসা।

হাটবারে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। এমনিতেই প্রতিদিন রাত দশটার মধ্যেই ফিরে আসে। বাজারের পুব মাথায় তাদের শুঁটকিপট্টি। আরো তিন জন শুঁটকি নিয়ে বসে। একটা লম্বা দোচালা ঘরে সার বেঁধে চারজন শুঁটকি ব্যবসায়ী তাদের শুঁটকির পশরা সাজিয়ে বসে।

হিদল, চ্যাপা, ছুরি, লইট্যা, ইচাসহ আরো নানা ধরনের শুঁটকি থাকে তাদের কাছে। এখন বর্ষা ধরে আসছে। নেমে যাচ্ছে খাল-বিলের পানি। বিভিন্ন নালা-ডোবা সেঁচে মাছ ধরা হবে। সেখান থেকে কাচকি মাছের শুঁটকি নিজেরাই তৈরি করবে। গৃহিণীদের কাজের চাপ বাড়বে। সারাদিন উঠোনে শুকোতে দেয়া মাছ পাহারা দিতে হয়। কাক-বেড়াল তাড়াতে হয়।

খোকন মিয়া আজ ফিরে আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলো উঠোনে কুপিটা জ্বলছে। জরিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার মনটা হু হু করে উঠলো। মেয়েটা আর বেশিদিন এ বাড়িতে থাকবে না। পাশের গ্রামের বশির হাজির মেজো ছেলের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে।

বড় পয়মন্ত মেয়ে। বাপের বড় ন্যাওটা। এতবড় হয়ে গেছে, অথচ এখনো হাট থেকে প্রতিদিন কিছু না নিয়ে আসলে রাগ করে। মুখ ভার করে থাকে। মুখ ফুলিয়ে থাকে।

জরিনার বিয়ে হয়ে গেলো। পুরো বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগলো। বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেলো। রহিমা তো মেয়েকে বিদায় দিতে গিয়ে কান্নায় বেসামাল হয়ে পড়লো। মূর্ছা গেলো।

একটামাত্র সন্তান। সান্ত্বনার কথা হলো মেয়েটা বেশি দূরে যাচ্ছে না।

বিয়ের তিন মাস পর মেয়ে নাইওর আসলো। মেয়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আসা অবধি ঘরে থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই নাকমুখ কোঁচকাচ্ছে। শুঁটকির গন্ধ সে সহ্য করতে পারছে না।

মা হেসে বললো, এত বছর তোর নাকে শুঁটকির গন্ধ লাগেনি। তিন মাস যেতে না যেতেই গন্ধ লাগা শুরু হয়েছে?

–যাই বলো মা, শুঁটকির গন্ধটা কিন্তু সহ্য করার মতো নয়।

মেয়েটা সারাক্ষণ নাকে আঁচল চাপা দিয়ে থাকলো। খোকন মিয়া মিটিমিটি হেসে ব্যাপারটা লক্ষ করতে লাগলো।

এক সপ্তাহ পর দেখা গেলো, জরিনা আর নাকে আঁচল চাপা দিচ্ছে না। দিব্যি শুঁটকিঘরেও আসা-যাওয়া করছে। একদিন মাকে বললো,

–মা, মাগো!

–কী?

–ঘরে তো এখন আর শুঁটকির গন্ধ নেই। গন্ধটা কিভাবে গেলো?

মা হেসে বললেন,

–নারে মা, শুঁটকির গন্ধ আগের মতোই আছে। তবে গন্ধটা তোর নাকে সয়ে গেছে।

দেখ্ মা! তোর শ্বশুর বাড়িতেও দেখবি, অনেক কিছুই তোর ভালো লাগবে না। পছন্দ হবে না। কষ্ট লাগবে। তবু, ভালো না লাগলেও, আঁচল চাপা দিয়ে সহ্য করে যাবি। দেখবি এক সময় আর কষ্টগুলোকে কষ্ট বলে মনে হবে না। শরীর-মনে সয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৪

মিথ্যার হাতেখড়ি

চোর সে সাংঘাতিক। পুরো অঞ্চল তার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ। যত জটিল তালাই হোক কুটিল বুদ্ধি দিয়ে সে খুলে ফেলবেই। ঘরদোর বন্ধ রেখে ও লাভ নেই। সে যদি ইচ্ছা করে, তাহলে যত মজবুত ছিটকিনিই লাগানো হোক না কেন, অনায়াসে ঢুকে পড়ে।

সিঁদ কাটার মতো ঝামেলা সে পোহাতে যায় না। এমনভাবে চুরি করে, কোনও প্রমাণও রেখে যায় না। তারপরও গ্রামবাসী অনেক দিন ধরে চেষ্টার পর, চোরের বউয়ের সহযোগিতায়, চোর বেটাকে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হলো। গ্রামের মুরুব্বিরা সালিশ বসালেন। চোরকে জেরা করলেন। তারা জানার চেষ্টা করলেন, কেন সে চুরি করে। তার তো টাকা পয়সার অভাব

নেই। তার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। দাদা ছিলেন একজন আলিম। এমন ঘরে জন্ম নিয়ে চোর হলো কী করে?

–আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, ছোটবড় সবাই, কথায় কথায় মিথ্যা বলে। একে অপরেরর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে। এসব দেখে-দেখেই আমি আস্তে আস্তে চুরি শিখেছি। আমার আশেপাশের লোকেরাই আমাকে চোর হতে সাহায্য করেছে।

–কিভাবে?

–নিজের ঘর থেকেই শুরু করি।

একদিন খাবার খেতে চাচ্ছি না দেখে আম্মু বললেন,

–তাড়াতাড়ি খাবারটুকু খেয়ে নাও সোনা! তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবো।

আমি ঝটপট খাবার খেয়ে আম্মুকে বললাম। আম্মু! চলো বেড়াতে চলো।

–এখন নয় বাবা! পরে যাবো। বাইরে ছেলেধরা ঘুরছে। বের হলেই ধরে নিয়ে যাবে।

মনমরা হয়ে বসে থাকলাম। শুনতে পাচ্ছিলাম বাইরে ছেলেরা খেলছে। হৈ-হুল্লোড় করছে। কই তাদেরকে তো ছেলেধরায় ধরছে না? এভাবে প্রায় প্রতিদিনই আমাকে মিথ্যা শুনতে হয়েছে।

আরেকটু বড় হলে স্কুলে গেলাম। প্রথম দিনই স্যার এসে আমাদেরকে বললেন,

–সারা বছর যে সুন্দর আচরণ করবে, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে, বছর শেষে তাকে শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া হবে।

–আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। যেন বেড়াতে যেতে পারি। বছর শেষে স্যারের কাছে গিয়ে বললাম,

–স্যার, সফরে যাবো না?

–কোন সফরের কথা বলছো? বুঝতে পারছি না।

বাড়িতে প্রায়ই আব্বু সন্ধ্যাবেলা পড়া দেখিয়ে দিতেন। আমাকে বলতেন,

–তুমি যদি লেখাপড়া করে ক্লাসে প্রথম হতে পারো তোমাকে সুন্দর একটা সাইকেল কিনে দেব।

–শেষ পরীক্ষায় অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রথম হলাম।

আব্বুকে বললাম, –আব্বু! সাইকেল?

–তুমি এখনো ছোট, সাইকেল চালালে দুর্ঘটনা ঘটবে। এখন সাইকেল থাক। পরে দেখা যাবে।

–তো মাতবর সাহেবরা! আমার চুরির বিচার করার আগে, যাদের কাছে চুরির প্রথম সোপান মিথ্যা শিখেছি, তাদের বিচার আগে করুন। আর আপনারাও যদি এমন কাজ করে থাকেন, নিজেদের বিচার আগে করুন।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৫

দুধ-চিকিৎসা

লুই পিউং। তাইওয়ানের একটা বাচ্চার নাম। ডাক্তারদের জন্য এক দুর্বোধ্য ধাঁধা। জন্ম থেকেই বাচ্চাটার দুটো কিডনি কাজ করছিলো না। এত ছোট্ট শিশু, অস্ত্রোপচার করারও কোনও উপায় নেই। কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হলো। এভাবে দশদিন চলে গেলো। ডাক্তাররা বাচ্চার মা-বাবাকে জানিয়ে দিলেন,

–বাচ্চার আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা নেই। তার লাইফ সাপোর্ট খুলে ফেলা হবে। সন্ধ্যা সাতটায়। মা-বাবা যেন শেষবারের মতো বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। দুঃখিনী মা পাগলপারা হয়ে গেলেন। অনেক কষ্টের সন্তান। সিজারে না হয়ে স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে। অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। এখন বাচ্চাটা এভাবে চলে গেলে সহ্য করা যায় কিভাবে?

জন্মের পর থেকে সোনাটাকে একটিবারের জন্যও কোলে নেয়া হয়নি। মায়ের একান্ত ইচ্ছা একটিবারের জন্য হলেও তাকে কোলে নেবেন। মাতৃত্বের স্বাদ নেবেন। খোকাটাকে শুধু একটিবার বুকের দুধ খাওয়াবেন। ডাক্তাররা অবাক হলেও মায়ের আব্দারটুকু মেনে নিলেন। যে মরেই যাচ্ছে, তার জন্য একটু উনিশ-বিশ হলোই বা।

মা কাঁপা হাতে 'ছানাটাকে' তুলে নিলেন। নড়াচড়া করানোয় কাঁদতে শুরু করে দিলো। মা পরম মমতায় সোনা-মাণিকটাকে বুকে জড়িয়ে দুধ খেতে দিলেন।

অবাক কাণ্ড! বাচ্চাটা চুকচুক করে দুধ খেতে শুরু করে দিলো। একটানা অনেকক্ষণ দুধ খেলো। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

কেবিনে ডাক্তার-নার্সদের ভিড় জমে গেলো। লাইফ সাপোর্ট খুলে নিয়েছেন সেই অনেক আগে। এতক্ষণে তো সব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ছেলে তো দিব্যি দুধ খেয়ে 'ভাতঘুম' দিচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠার পর ডাক্তাররা পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন। বাচ্চাটার কিডনি কাজ করতে শুরু করেছে। কিডনি স্বাভাবিকভাবেই মায়ের দুধকে ছেঁকে নিচ্ছে। ছাঁকার কাজ করছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ছেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৬

রিযিকের টানে

এক লোক কূপে পড়ে গেলো। বিকট আওয়াজে চিৎকার করতে লাগলো:
–বাঁচাও! বাঁচাও!

গ্রামের লোকেরা আর্তচিৎকার শুনে উদ্ধার করতে দৌড়ে এলো। একটা রশি নামানো হলো। লোকটা রশি বেয়ে উঠে এলো। সে হাঁপাচ্ছিলো। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছিলো। ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন দেখাচ্ছিলো তাকে। একজনের কাছে তাজা দুধ ছিলো। সে একগ্লাস দুধ খেতে দিলো। লোকটা ঢকঢক করের দুধটুকু খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললো। লোকেরা জানতে চাইলো,
–তুমি কূপে পড়ে গেলে কিভাবে?
– আমার মেষগুলোকে পানি পান করাতে এসেছিলাম। বালতিটা কূপে ফেলে উপরের দিকে টানছিলাম। তখন আমি এভাবে কূপের কিনারায় দাঁড়িয়েছিলাম।

লোকটা কিভাবে কূপের কিনারায় দাঁড়িয়েছিলো সেটা হুবহু দেখাতে গিয়ে, আবার কূপে পড়ে গেলো। এবার পড়ে আর বাঁচলো না। বেকায়দায় পড়ে বেমক্কা ঘাড় মটকে মারা গেলো। গ্রামের লোকজনের আফসোসের সীমা রইলো না।

গাঁয়ের ইমাম সাহেব পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন,
–লোকটা কূপ থেকে উঠে এসেছিলো মূলতঃ রিযিকের টানে। রিযিকের এক গ্লাস দুধ তার পাওনা রয়ে গিয়েছিলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৭

হাঁস শিকার

অনেকদিন নানার বাড়ি যাওয়া হয় না। আব্বু বললেন এবার বার্ষিক পরীক্ষার পর কোথাও বেড়াতে যাবেন। আলিফ বলে উঠলো,

–আব্বু! নানাবাড়িতে গেলে কেমন হয়?

–খুব ভালো হয়!

–তাহলে আমরা নানাবাড়ি যাবো। আপুও যেতে রাজি আছে।

– ওরে বাবা! এ যে দেখি তলে তলে অনেকদূর হয়ে গেছে।

আলিফ আর হাবীবা ছোট মামার সাথে গতকাল নানাবাড়ি এসেছে। নানু কত আদর করছেন। কত কী খেতে দিচ্ছেন। রাতে জড়িয়ে ধরে গল্পও বলেছেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। আবেশে দু'চোখ মুদে এসেছিলো। গতকাল আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো। আলিফ সকালে উঠে দেখে উঠোনে কত কত হাঁস! প্যাঁক প্যাঁক করছে। একটা হাঁস ছিলো সবচেয়ে বড়। রাজহাঁস। কী সুন্দর! ধবধবে শাদা। রাজকীয়।

ছোট মামা একটা গুলতি বানিয়ে দিয়েছেন। এক গণ্ডা মার্বেলও দিয়েছেন। নাস্তা করেই আলিফ গুলতি নিয়ে বাগানের দিকে ছুটলো। ওখানে হাঁসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো এতক্ষণ পুকুরে ছিলো। এখন বোধহয় কুঁড়ো খেতে এসেছে।

আলিফ বাগানে বাগানে ঘুরে অনেকক্ষণ হাতের তাক ঠিক করার মশকো করলো। একটা মার্বেলও জায়গামতো লাগাতে পারলো না। এবার দুষ্টুমি করে বড় সুন্দর হাঁসটার দিকে গুলতি দিয়ে একটা মার্বেল ছুঁড়ে মারলো। সে অবাক হয়ে দেখলো, মার্বেলটা গিয়ে হাঁসটার মাথায় লেগেছে। হাঁসটা লাফিয়ে উঠে, ডানা ঝাপটে, কিছুদূর গিয়েই নেতিয়ে পড়লো।

আলিফ ভয় পেয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে হাঁসটাকে বাগানের একটা ঝোঁপে লুকিয়ে ফেললো।

ঘটনাটা হাবীবা দূর থেকে দেখে ফেললো। দুপুরে খাবারের পর নানী বললেন,

–হাবীবা! এসো আমাকে রান্নাঘরের কাজে সহযোগিতা করো তো!

হাবীবা চটজলদি বললো,

–নানু! আলিফ রান্নাঘরের কাজ খুবই আগ্রহের সাথে করে। তাকে সাথে রাখুন।

এরপর আলিফের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললো,

–হাঁসের কথা মনে আছে?

আলিফ কিছু না বলে কাজে লেগে গেলো।

বিকেলে নানু আবার বললেন,

–এবার সবাই মিলে খেলতে যাও। শুধু হাবীবা আমার কাছে থাকো। আমি পিঠা বানাবো, আমাকে সাহায্য করো।

–নানু! আলিফ পিঠা বানাতেও বেজায় পছন্দ করে।

এরপর আলিফের কানে কানে বললো,

–হাঁসের কথা মনে আছে?

এভাবে দুতিনদিন পার হয়ে গেলো। আলিফ একাই সব কাজ করে গেলো। শেষে আর থাকতে না পেরে, নানীর কাছে গিয়ে কৃত অপরাধ স্বীকার করলো।

–নানু! হাঁসটাকে আমিই মেরেছি। ভয়ে আর লজ্জায় আপনাকে বলতে পারিনি। আমাকে মাফ করে দিন।

নানু সাথে সাথেই আলিফকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন,

–তুমি যে হাঁসটা মেরেছো সেটা আমি দেখেছি। আমি তখন জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছু মনে করিনি। তোমাকে সেটা বলিনি। কারণ শুধু জানতে চাচ্ছিলাম, তুমি কতদিন পর্যন্ত হাবীবার কাছে নত হয়ে থাকাটা সহ্য করতে পারো।

শোন! তুমি যতই অন্যায় করো, নিজেকে শয়তানের দাস বানিয়ে রেখো না। আল্লাহ তা'আলা সব জায়গায় আছেন। তোমাকে দেখছেন। তিনি তোমাকে ভালোবাসেন। তুমি তার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কোনও অপরাধের হাতেই বন্দী হয়ে থেকো না। অপরাধ হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা-ইস্তিগফার করে ফেলবে।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৮

স্বামী বশীকরণ মন্ত্র

গ্রামের মসজিদ। ইমাম সাহেব বসে আছেন। একজন মহিলা এলো।

–হুজুর! আমাকে একটা তাবিজ দিন।

–কিসের তাবিজ?

–আমার স্বামী যাতে আমাকে ভালোবাসে। আমি যাতে তার হৃদয় পেতে পারি। তার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি।

–এই তাবিজ দেয়া তো কঠিন।

–যত টাকা লাগে, আমি দেব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

–টাকা নয়, লাগবে একটা জিনিস।

–কী সেটা?

–বাঘের মাথার পশম।

–ওরে বাবা! আমি বাঘের মাথার পশম পাবো কোথায়?

–চেষ্টা করে দেখুন। এটা না হলে তাবিজ দেয়া যাবে না।

–আচ্ছা; ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখি। সংগ্রহ করতে পারি কিনা।

মহিলা বাড়ি গিয়ে অভিজ্ঞ মহিলাদের সাথে পরামর্শ করলো, বাঘের মাথার লোম কিভাবে পাওয়া যায়? সবাই বললো,

–এটা কিভাবে পাবে তুমি!

–আমাকে পেতেই হবে।

–তাহলে তো তোমাকে একটা বাঘকে পোষ মানাতে হবে।

–কিভাবে পোষ মানাবো?

–বাঘের পেট ভরা থাকলে সাধারণত কাউকে কিছু বলে না। প্রতিদিন কিছু কিছু খাবার দিয়ে দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

গ্রামের পাশেই বড় বন। মহিলা কিছু গোশত নিয়ে বনে গেলো। বাঘের গুহার কাছে গিয়ে দূর থেকে গোশতগুলো ছুঁড়ে ফেলে এলো। দেখলো কিছুক্ষণ পর বাঘ এসে গোশতগুলো খেয়ে ফেললো।

পরদিন আবার গোশত নিয়ে এলো। গতকালের তুলনায় বাঘের আরেকটু কাছে দাঁড়ালো। এভাবে প্রতিদিন এগিয়ে আসতে আসতে এক সময় দেখা গেলো, বাঘ মহিলার হাত থেকেই গোশত খাচ্ছে।

শেষে এমন হলো যে, মহিলা বাঘের মাথায় হাত না বুলালে বাঘ খাওয়াই শুরু করতো না। একদিন সুযোগ বুঝে বাঘের মাথা থেকে কিছু পশম তুলে নিলো। ইমাম সাহেবের কাছে এলো।

–হুযুর! এই নিন বাঘের মাথার লোম।

–কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন?

–প্রথমে বাঘকে পোষ মানানোর পরিকল্পনা করলাম। দেখলাম বাঘের মনে স্থান পেতে হলে প্রথমে তার পেট শান্ত করতে হবে। এই মূলনীতি অনুসরণ করে, নিয়মিত ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। অল্প কিছুদিন পরই বাঘ পোষ মেনে গেল।

–কী মনে হয়, আপনার স্বামীর মন বাঘের মনের চেয়েও শক্ত?

–না, তা মনে হয় না।

–তাহলে বাঘের মনে যেভাবে পেট হয়ে ঢুকেছেন, বাঘের মন পেতে যেভাবে পরিকল্পনা করে এগিয়েছেন, সময় ব্যয় করেছেন, সেভাবে স্বামীর মনেও ঢোকার পরিকল্পনা হাতে নিন। এরপর নিয়মিত ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যান।

স্বামীর উদর পূর্তির ব্যবস্থা করুন। দেখবেন তার মন ফুর্তিতে ভরে গেছে। তারপর আপনার জন্যে বেশ ভালোবাসাও এসে গেছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৪৯

ব্যাংক ডাকাতি

ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) অনুষদের একটি ক্লাস। অধ্যাপক ক্লাসে প্রবেশ করে আর ডায়াসে (মঞ্চে) উঠলেন না। ছাত্রদের সারির মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

–তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একটা গল্প বলবো। আমার গল্প বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা অতি দ্রুত গল্পটার বিশ্লেষণ লিখে জমা দেবে। তোমাদের সুবিধার্থে আমি গল্পটাকে কয়েকটা ধাপে বলছি। পুরো গল্পটা একবারেই বলে ফেললে, তোমাদের হয়তো মনে থাকবে না। বিশ্লেষণ করতে পারবে না। তাই একটা ধাপ বলার পরপরই তোমরা বিশ্লেষণ লিখে ফেলবে। তোমাদের লেখা শেষ হলে আমি আমার বিশ্লেষণটা বলবো। তোমরা নিজেরটার সাথে মিলিয়ে দেখবে।

প্রথম ধাপ : গল্প

সরকারী ব্যাংক। শুরু থেকেই এই ব্যাংকের বেশ নামডাক। দিনদিন লেনদেনের পরিমাণ বেড়েই চলছে। এসব দেখে একদল ডাকাত ঠিক করলো ব্যাংকটা লুট করবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে একদিন তারা ব্যাংকে হানা দিলো। কর্মচারীরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। ডাকু সর্দার ফাঁকা গুলি করে বললো,

–টাকা গেলে সরকারের যাবে। প্রাণ গেলে যাবে নিজের। কোনটা বাঁচাবেন ঠিক করুন।

একথা শুনে কেউ আর বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো না। ডাকাতরা অনায়াসে ডাকাতি করে নিরাপদে বের হয়ে গেলো।

বিশ্লেষণ : প্রথম ধাপ

অধ্যাপক ছাত্রদের খাতা দেখলেন। তারপর বললেন, তোমরা যা লিখেছো, মোটামুটি হয়েছে। এবার আমার বিশ্লেষণ শোন। ঘটনার এই পর্যায়ে দুইটা দিক উল্লেখ করা যায়।

এক: মানুষের চিন্তার গতি বদলে দিলে, কাজ হাসিল করতে সুবিধা। মানুষ প্রথাগতভাবে যেভাবে চিন্তা করে তার গতিটুকু বদলে দিতে পারলে কাজ হাসিল করাটা সহজ হয়ে যায়। ব্যাংকের লোকজন ভাবছিলো হায়! হায়! সব তো লুট হয়ে যাচ্ছে? আমাদের কী হবে? তখন ডাকুসর্দার বুঝিয়ে দিলো, এই ডাকাতিতে তোমাদের কোনও ক্ষতি নেই। ক্ষতি যা হবার সরকারের হবে।

দুই: মানুষের মাঝে স্বার্থভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করো। তাহলে তারা অন্যায় প্রতিরোধে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। দেখো, সর্দার ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বার্থচিন্তা ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। এখানে তোমাদের কোনও স্বার্থ নেই। কেন শুধু শুধু প্রতিরোধ করতে গিয়ে পৈতৃক প্রাণটা খোয়াবে?

দ্বিতীয় ধাপ : গল্প

ডাকাতির সময় ব্যাংকে কিছু মহিলাও ছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো তারা জড়োসড়ো হয়ে টেবিলের নিচে, আড়ালে আবডালে লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যটা অভিজ্ঞ সর্দারের দৃষ্টি এড়ালো না। সর্দার মহিলাদেরকে অভয় দিয়ে বললো,

–ভয় পাবেন না। আমরা ব্যাংক লুট করতে এসেছি, মানুষ নয়।

বিশ্লেষণ : দ্বিতীয় ধাপ

পেশাদারি মনোভাব পোষণ করা। শুধু যে কাজে নেমেছো সে কাজে মনোযোগ দাও। অপ্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগ দিয়ে মূল কাজে ব্যাঘাত ঘটিও না।

তৃতীয় ধাপ : গল্প

ডাকাতরা তাদের বস্তা ভর্তি করে যা পেরেছে টাকা-পয়সা নিয়ে, নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল । সবাই খুশি। অনেকদিন পর একটা বড় দাঁও মারা গেছে। ডাকুদের দলে একজন সদ্য স্নাতক উত্তীর্ণ বেকার যুবকও ছিলো। সে বললো,

–সর্দার! এবার আমরা লুণ্ঠিত টাকাপয়সা গুনে ফেলি?

সর্দারঃ না, সেটার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু কেনো কষ্ট করতে যাবো? একটু অপেক্ষা করো। টিভি-রেডিওতেই তো বলবে, কত টাকা ডাকাতি হয়েছে।

বিশ্লেষণ : তৃতীয় ধাপ

এটাকে বলে অভিজ্ঞতা। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় খুব বেশি নয়। জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। সর্দার পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই বলে দিয়েছে, লুণ্ঠিত টাকা-পয়সা গোনার প্রয়োজন নেই। অহেতুক পণ্ডশ্রম।

চতুর্থ ধাপ : গল্প

ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর, ম্যানেজার সহকারীকে বললেন,

–তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দিন। বেশি দেরি হলে ডাকাতগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

সহকারী বললো,

–স্যার, আমরা প্রথমে এলাকার এমপি বা মন্ত্রী কাউকে খবর দেই। ওনারা আগে এসে ব্যাপারটা দেখুক। মন্ত্রী এলেন। সাথে স্থানীয় এমপি আর এলাকার কমিশনারও এলো। তাদেরকে পরিস্থিতি খুলে বলা হলো। মন্ত্রী বললেন,

–ঠিক আছে ম্যানেজার, ব্যাপারটা আমি দেখছি। আপনাকে আর এটা নিয়ে ভাবতে হবে না। এরপর মন্ত্রী মহোদয় পিএসকে বললেন,

–এই, ওসি সাহেবকে খবর দে।

ওসি সাহেব এলেন। মন্ত্রী মহোদয় ওসিকে বললেন,

–ওসি সাহেব! ডাকাত তো দেখি বেশি কিছু নিতে পারেনি। এখনো বলতে গেলে সবকিছুই রয়ে গেছে। ডাকাতি যে করেছে সব দোষ তো তারই হবে। আসুন, বাকি যা আছে তা আমরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে যাই। কিছু অংশ ব্যাংকের লোকজনের ভাগেও জুটলো।

এসব দেখে, ব্যাংকের ম্যানেজার আনন্দে বগল বাজাতে লাগলো। শেয়ার বাজারে যে টাকাগুলো মার গিয়েছে সেগুলো অন্য পথে এসে হাতে ধরা দিয়েছে। মন্ত্রী-এমপিদের কাণ্ড-কারখানা দেখে ম্যানেজার বললেন,

–ইশ! এভাবে যদি প্রতিদিন লুট-ছিনতাই লেগেই থাকতো!

বিশ্লেষণ : চতুর্থ ধাপ

এক : এটাকে বলে স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দেয়া এবং সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই সদ্ব্যবহার করা।

দুই : এটাকে বলে মানুষের গলায় ছুরি চালানো। নিজের সুবিধাকে জাতির সুবিধাদির উপরে স্থান দেয়া। একেই বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার।

পঞ্চম ধাপ : গল্প

পরদিন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হলো, দুর্ধর্ষ ব্যাংক ডাকাতি। প্রকাশ্য দিবালোকে একশ কোটি টাকা নিয়ে ডাকাতদলের পলায়ন। এখনো পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে। ডাকাতদল এই সংবাদ পড়ে তো আকাশ থেকে পড়লো। সবাই বারবার গুণেও হিসাব মেলাতে পারলো না। তাদের হাতে আছে মোটে এক কোটি টাকা।

ডাকু সর্দার বললো,

–আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাত্র এক কোটি টাকা পেলাম। অথচ ওরা বিনা পরিশ্রমেই নিরানব্বই কোটি টাকা পেয়ে গেলো। তাহলে তো দেখি ডাকাত না হয়ে পড়ালেখা করে বড় সড় কোন চাকুরি নিলেই হতো।

বিশ্লেষণ : পঞ্চম ধাপ

চুরি ডাকাতির ইচ্ছা থাকলে বড়বড় কোনো একটা পদ বাগিয়ে নিতে পারলেই হলো। যে যত বড় পদের অধিকারী, তার চুরি ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কম। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে দাঁড়ানোই প্রথম পছন্দ।

জীবন জাগার গল্প : ১৫০

বৃদ্ধাশ্রম

শায়খ সা'দ যগলুল নাজ্জার। ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম প্রচরক। ইউরোপ-আমেরিকা চষে বেড়ান। কোথাও দাওয়াতের সামান্যতম সুযোগ দেখলেই ছুটে যান। তার হাতে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। উনি একটা ঘটনা বলেছেন:

–সেবার গেলাম টেক্সাসে। একটা সেমিনারে বক্তা হিশেবে। দু'দিন পর আমাদের সেমিনার শেষ হলো। ভিসার মেয়াদ ফুরোতে আরও আটাশ দিন। আমরা চিন্তা করলাম, টেক্সাসের বিভিন্ন আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখবো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বৃদ্ধনিবাস ইত্যাদি।

এই তো সেদিন গেলাম এক বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানের এক কর্মকর্তা আমাদেরকে পুরো কমপ্লেক্সটা ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগানে গেলাম। সেখানে এককোণে একজন বৃদ্ধ চুপচাপ বসে আছেন। বয়স প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই। চোখে কালো চশমা, মানে অন্ধ। অন্যদেরকে পেছনে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধলোকটার সাথে কুশল বিনিময় করলাম। লক্ষ করে দেখলাম, লোকটা কাঁপছে। জিজ্ঞেস করলাম,

–আপনি কাঁপছেন কেন?

বৃদ্ধ সামান্য ইতস্তত করে বললো,

–আমি আজ তিনদিনের অভুক্ত।

–এখান থেকে খাবার দেয় না?

–খাবার তো দেয়। কিন্তু সেটা মুখে দেয়া যায় না। এধরনের খাবারে আমি অভ্যস্ত নই। এখানে এতদিন হয়ে গেলো, তবুও এখানকার খাবারে অভ্যস্ত হতে পারিনি।

আমার সাথে একটা ছোট্ট ব্যাগে কিছু খাবার ছিলো। খাবার মানে, ঘরে বানানো কয়েকটা স্যান্ডউইচ। বাড়িয়ে দিলাম। বৃদ্ধ বড় আগ্রহ ভরে খেলেন। দেখে আমার মায়া লাগলো।

–আপনার কোনও সন্তানাদি নেই?

প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধ মাথা নিচু করে ফেললো। চশমার ফাঁক গলে, গাল বেয়ে পানি গড়াতে লাগলো। বৃদ্ধ বললেন:

–আছে, চারজন। তিন ছেলে, এক মেয়ে। তারা সবাই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। সবাই আমাকে ছেড়ে আলাদা বাস করছে।

আমি একাই বাসায় থাকতাম। শীত-গ্রীষ্মে সময়টা বড়ই কষ্টে কাটতো। একদিন ছোট ছেলেটা এলো। এই ছেলেটা অন্যান্য সন্তানের তুলনায় আমার প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দিতো। সে বললো,

–আব্বু! তোমাকে আর এ-বাড়িতে একা একা থাকতে হবে না।

আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেলো। যাক এতদিনে তাহলে ছেলের সুমতি ফিরছে। বৃদ্ধ বাবাকে আর একা ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কলিজার টুকরা নাতি টমের সাথে খেলতে পারবো। ছোট্ট পুতুলের মতো নাতনি জিনিয়াকে কোলে নিয়ে ঘুরতে পারবো।

একদিন ছেলে আমার জামাকাপড় গুছিয়ে একটা ব্যাগে ভরলো। আমাকে নিয়ে চললো। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলাম, কখন টম-জিনিয়ার সাথে দেখা হবে। ছেলে আমাকে নিয়ে একটা বড় অফিসে বসাল। আশেপাশে দেখলাম আরও ক'জন বৃদ্ধ বসে আছে। একটু পরে, ছেলে আমার হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিলো। বললো,

–তোমার ডাক আসলে ওই ডানদিকের কামরায় যাবে। অফিসার যা যা প্রশ্ন করে ঠিকঠাক উত্তর দেবে।

–এটা কিসের অফিস, জ্যাক?

–এটা একটা বৃদ্ধাশ্রম। তুমি এখানে আরামেই থাকবে। আমার একটা বাসা দরকার। তাই কিছুদিন আমি আর মেরি তোমার বাসায় উঠবো।

অন্য ভাইবোনেরা এতে সম্মতি দিয়েছে। ওদের কথা হলো, তারা সবাই ব্যস্ত। তোমার কথা ভাবতে পারবে না। আমি যদি তোমার বৃদ্ধাশ্রমে থাকার খরচ বহন করি, তাহলে তোমার বাসায় আমার থাকা নিয়ে ওদের কোন আপত্তি নেই।

জ্যাকের কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম,

–হায়, আমার যদি কোনও সন্তানই না হতো! আমি যদি নিঃসন্তান হতাম!

শায়খ যাগলুল বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন,

–তারা কেউ আপনাকে দেখতে আসে না?

–আমার এখানে আসার পর দু'বছর কেটে গেছে। ওদের কেউই আমাকে দেখার জন্য আসেনি। আমি সারাদিন পথ চেয়ে থাকি হয়তো ওরা কেউ আসবে, কিন্তু দিন গড়িয়ে রাত হয়, রাত পেরিয়ে সকাল হয়, কেউ আসে না।

–আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন ওদেরকে সুমতি দেন।

–না, আমি ওদের জন্য দু'আ করবো না। আমি শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের কাছে ওদের নামে নালিশ করবো।

এই কথা বলেই বৃদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি বিদায় নিয়ে বের হয়ে এলাম। বলে এলাম, সময় করে মাঝে মধ্যে আপনাকে দেখে যাবো। কয়েকদিন পর বৃদ্ধকে দেখার জন্য গেলাম। গিয়ে শুনি উনি মারা গেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম ওনার শেষকৃত্যে সন্তানদের কেউ এসেছিলো কিনা?

–আমরা ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। তারা বললো, আপনারা আশ্রমের পক্ষ থেকে অন্তেষ্টিক্রিয়া সেরে ফেলুন। আমরা এই মুহূর্তে আসতে পারবো না। খরচ যা লাগে, পাঠিয়ে দেবো।

জীবন জাগার গল্প : ১৫১

মোহরানা

গত শতাব্দির মাঝামাঝি একটা সময়। লিবিয়ার ছোট্ট এক বসতি, 'হাইউশ শামস'।

এক পিতা ঠিক করলেন, ছেলেকে বিয়ে করাবেন। পাত্রী দেখা হয়ে গেছে। পাত্রের বাবা কাজে কোনরকম খুঁত রাখলেন না। পাত্রীর বাবাকে অগ্রিম মোহরানা আদায় করে দিলেন। নগদ পাঁচশ টাকা। সে সময় পাঁচশ টাকা মানে অনেক টাকা।

বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু পাত্রীর পিতার বাড়াবাড়িতে রাত হওয়ার আগেই বিয়ে ভেঙে গেলো। পরে জানা গেলো পাত্রীর বাবা ইচ্ছা করেই বিয়ে ভেঙেছে। এটা তার এক ধরনের ব্যবসা। পাত্রপক্ষ মোহরানার টাকা ফেরত চাইলো। মেয়ে পক্ষ বললো কিসের টাকা? আমরা তো কোনও টাকা নেইনি?

–কেন, গত সপ্তাহেই তো গুনে গুনে পাঁচশ টাকা মোহরানা বাবদ আদায় করা হলো?

–নাহ, মোহরানা বাবদ কোনও টাকা দেয়া হয়নি।

কোর্টে মামলা করা হলো। বিচারক নির্দিষ্ট তারিখে দুপক্ষকে হাজির থাকতে বললেন।

বিচারক: আপনি কি মেয়ের বাবাকে মোহরানার টাকা দিয়েছেন?

–জি, আমি মোহরানার পাঁচশ টাকা নগদ আদায় করেছি।

বিচারক: আপনি কি আপনার মেয়ের মোহরানা বাবদ পাঁচশ টাকা বুঝে পেয়েছেন?

–আমি কোনও টাকাই পাইনি।

ঠিক আছে, দুজনেই আল্লাহর নামে শপথ করুন। দুজনেই যার যার স্বপক্ষে শপথ করলো। বিচারক উপায়ান্তর না দেখে মেয়ের পিতার অনুকূলে রায় দিয়ে দিলেন।

ছেলের পিতা বললেন,

–দুনিয়ার আদালতে হেরে গেলাম। আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করে রাখলাম। সেখানে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেই। মেয়ের বাবা রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন, মেয়ে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। মেয়ের মা বললো, মেয়েটা দুপুর থেকেই এমন করছে। সময় যতই গড়াচ্ছে ছটফটানি বেড়েই যাচ্ছে।

ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার কিছুই ধরতে পারলো না। হাসপাতাল থেকে বলা হলো, রাজধানী ত্রিপোলিতে ইতালিয়ান হাসপাতালে নিয়ে যেতে। লিবিয়া তখন ইতালির উপনিবেশ।

মেয়ের বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ত্রিপোলির দিকে ছুটলো। হাসপাতালের ডাক্তার দেখেশুনে বললেন,

–পেটে টিউমার হয়েছে। জটিল অস্ত্রোপচার করতে হবে। মেয়ে বাঁচতেও পারে, মারাও যেতে পারে। আর খরচ তো আছেই।

–আপনি খরচের চিন্তা করবেন না। মেয়েটাকে বাঁচান।

অস্ত্রোপচারের পর মেয়েটা আর বাঁচলো না। পিতা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলেন। হিসাব করে দেখলেন চিকিৎসা বাবদ তার খরচ হয়ে গেছে পাঁচশ টাকা।

জীবন জাগার গল্প:১৫২

সংখ্যার আলোকে মানবচরিত্র

আল খাওয়ারেজমি। এক তাবড় গণিতবিদ। এলগরিদম আর লগারিদমের আবিষ্কর্তা। তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো 'মানুষ' কী?

তিনি উত্তর দিলেন:

ঃ মানুষ যদি চরিত্রসম্পন্ন হয়, তাহলে তার মূল্যমান 'এক'।

ঃ মানুষটা যদি সৌন্দর্যের অধিকারী হয়, তাহলে একের সাথে একটা শূন্য যোগ হবে। এখন হলো 'দশ'।

ঃ যদি মানুষটা সম্পদের অধিকারীও হয়, তাহলে আরেকটা শূন্য যোগ হবে। এখন হলো, একশত।

ঃ মানুষটা যদি সদ্বংশের অধিকারী হয়, তাহলে আরেকটা শূন্য যোগ হবে। এখন হলো একহাজার।

ঃ এখন যদি এই একহাজার থেকে 'এক' সংখ্যাটাকে (যেটা চরিত্রের জন্য নেয়া হয়েছে) সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে থাকে মূল্যহীন কয়েকটা শূন্য।

–চরিত্রগুণ ছাড়া মানুষও এমনি মূল্যহীন।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৩

সৌভাগ্যের রহস্য

দুই বন্ধু মিলে ঠিক করলো, সুখ আর সৌভাগ্য বিষয়টা কী, এর সন্ধানে বের হবে। মা-বাবা থেকে বিদায় নিয়ে বের হলো।

দু'জন গিয়ে উঠলো এক জ্ঞানী লোকের পাঠশালায়। জানতে চাইলো,

–জনাব! সুখ আর সৌভাগ্য কী? সেটা পাওয়ার উপায়ই বা কী?

–তোমরা অপেক্ষা করো। খাবারের পর উত্তর পাবে।

পাঠশালার সবাই খেতে বসলো। বড় এক গামলায় করে দুই বন্ধুকে পাতলা টলটল করে রান্না করা সুরুয়া জাতীয় এক প্রকার খাবার দেয়া হলো। সাথে লম্বা হাতাওয়ালা একটা করে চামচ দেয়া হলো।

জ্ঞানী লোকটি বলে দিলেন,

–এই পাঠশালায় খাবারের নিয়ম হলো, চামচের হাতার আগায় ধরে খেতে হবে।

দুই বন্ধু অনেক চেষ্টা করলো, কিছুতেই লম্বা চামচের মাথাটা মুখের কাছে আনতে পারল না। জোর করে মুখের কাছে আনতে গিয়ে গায়ের জামা-কাপড় নষ্ট হলো। শেষ পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় দস্তরখানা ছাড়লো।

জ্ঞানী লোকটি বললেন, লক্ষ্য করে দেখো।

তিনি একটা চামচ হাতে নিয়ে সেটাকে সুরুয়া-ভর্তি করে পাশের জনের মুখে ধরলেন। পাশের জনও তার সুরুয়া-ভর্তি চামচ তার মুখে ধরলো। এভাবে দুজনের খাওয়া শেষ হলো।

জ্ঞানী লোক দাঁড়িয়ে বললেন,

– জীবনের দস্তরখানায়ও, যে শুধু নিজেকে তৃপ্ত করতে চায় সে ক্ষুধার্ত থেকে যায়। প্রকৃত সুখী হতে পারে না।

আর অন্যকে তৃপ্ত করতে চাইলে, সুখী করতে চাইলে উভয়েই তৃপ্ত আর সুখী হয়। যে অন্যকে দিতে চায় সে-ই সুখী হয়। তোমার আশপাশকে সুখী করা ছাড়া তুমি সুখী হতে পারবে না।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৪

কৃপণের কাণ্ড

রজব মিয়া অত্যন্ত কৃপণ হিশেবে পরিচিত। একদিন তার বাড়িতে মেহমান এলো। একদম ছেলেবেলার সাথী। দরজায় এসে পড়লো। না করা গেল না।

রজব মিয়া (মেহমান-বন্ধুকে শুনিয়েই) ছেলেকে বললো,

–বাবা! আমার খুবই প্রিয় এক বন্ধু এসেছে, এই নাও টাকা। ভালো দেখে গোশত নিয়ে এসো।

ছেলে বাজারে গেলো। কিছুক্ষণ পর গোশত ছাড়াই ফিরে এলো।

–কি রে, গোশত কোথায়?

–বাজারে কসাইয়ের দোকানে গিয়ে বললাম, ভালো দেখে গোশত দিন তো?

কসাই বললো, আমি আপনাকে একেবারে মাখনের মতো নরম তুলতুলে তাজা গোশত দিচ্ছি।

–আমি ভাবলাম, মাখনের মতো গোশত যদি ভালো হয়, তাহলে গোশত না কিনে মাখন নিয়ে গেলেই তো হয়। যেই ভাবা সেই কাজ। মুদি দোকানে গেলাম।

–আমাকে ভালো দেখে মাখন দিন তো!

–আপনাকে মধুর মতো মিষ্টি মাখন দিচ্ছি।

আমি মনে মনে ভাবলাম,

–মধুর মতো মিষ্টি-মাখন যদি ভালো হয়, তাহলে মাখন না কিনে মধু কিনে নিয়ে গেলে তো বোধ হয় আরো ভালো হয়। মধুর দোকানে গেলাম।

–ভালো জাতের মধু দিন তো!

–আপনাকে পানির মতো স্বচ্ছ মধু দিচ্ছি। খেয়ে তৃপ্তি পাবেন।

ভাবলাম,

–ঘটনা যদি এমনই হয়, তাহলে তো আমাদের ঘরেই স্বচ্ছ পানি আছে, আর মধু কিনতে হবে কেন? বাড়ি থেকে স্বচ্ছ পানি খেয়ে নিলেই তো হয়!

মুদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, কোনও কিছু না কিনেই ফিরে এলাম।

বাবা বললেন,

–মাশা আল্লাহ। পিতার মতোই মহৎ-উদার আর বুদ্ধিমান হয়েছো। আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুন তোমাকে। (মেহমানকে শুনিয়েই বলা হচ্ছে।)

এবার পিতা ছেলের কানে কানে চুপিচুপি বললেন,

–বাবা! একটা ব্যাপার তো বোধহয় তুমি ঠিক রাখতে পারোনি।

–কী আব্বু?

–তুমি দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে তো পাঁচ বছর আগে কেনা জুতোগুলো ক্ষইয়ে ফেলেছো?

–আব্বু! আপনি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছেন। আমি মেহমানের জুতো পায়ে দিয়েই বাজারে গিয়েছি।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৫

আত্মত্যাগ

সুনামির আগে। ঝাওঝিং। চীনের এক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রাম। রাজধানী বেইজিং থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে। এই গ্রামের তরুণ কৃষক চাওমিং। দুপুরবেলা দাঁড়িয়ে আছে, এক পাহাড়ের ওপর। একটা গাছের ছায়ায়। দুপুরের খাবারটা খাবে, একটু বিশ্রাম করবে।

দূরে সাগরতীর দেখা যাচ্ছে। আরেক দিকে, পাহাড়ের পাদদেশে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। ফসল কাটার সময় এসে গেছে। আর কয়দিন পরেই ফসল কাটা শুরু হবে। এতদিনের পরিশ্রমের শস্য গোলায় উঠবে।

এবার ফসল কাটা চাওমিংয়ের জন্য অন্য এক ব্যঞ্জনা নিয়ে আসছে। গ্রামের মোড়ল কথা দিয়েছেন, ফসল উঠলেই মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেবেন। তবে শর্ত দিয়েছেন মোটা অংকের পণ দিতে হবে। শস্যের সিংহভাগ দিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ চাওমিং অনুভব করলো তার পায়ের নিচের মাটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। কম্পনটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। সাগরের দিকে তাকালো। দেখলো, পানিগুলো পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে।

এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে চাওমিং বুঝতে পারলো, বড় ধরনের বিপর্যয় আসছে। সাগরের পানি যখন পেছন দিকে সরে যায় সেটা অনেকটা হিংস্র জন্তুর মতো হয়। হিংস্র জন্তুও শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে শক্তি অর্জন করে। এরপর বিকট গর্জন করে, দানবীয় শক্তিতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চাওমিং ভীত হয়ে পড়লো। যে কোনও মুহূর্তে জলোচ্ছ্বাস এসে পড়বে। পুরো গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ফসলের ক্ষেত ডুবে যাবে।

এখন প্রথমে গ্রামের মানুষকে জানাতে হবে।

সে চিৎকার করে সবাইকে ডাকলো। চেঁচিয়ে গলা ব্যথা করে ফেললো। পাহাড়ের উপর থেকে এত দূরের ক্ষেতগুলোতে তার আওয়াজ পৌঁছলো না।

চাওমিং তখন একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিলো।

সে পাহাড়ের নিচে থাকা তার ফসলের জমিতে আগুন ধরিয়ে দিলো। শুকনো ফসলে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। আগুনের লকলকে লেলিহান শিখা অনেক দূরের জমিতে কাজ করা কৃষকেরাও দেখতে পেলো। সবাই আগুন নেভাতে দৌড়ে এলো।

চাওমিংও তরতর করে পাহাড় থেকে নেমে, তাদের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। সবাই অবাক, ব্যাপার কি?

চাওমিং নিজের জমির আগুন নেভানো বাদ দিয়ে আমাদের দিকে দৌড়াচ্ছে কেন?

সবাই অর্ধেক পথে থাকতেই সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে দিলো।

–জলোচ্ছ্বাস আসছে। সবাই পালাও! পালাও!

সবাই বউবাচ্চাসহ, নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য, নিজ নিজ বাড়ির দিকে, পড়িমরি করে ছুটলো।

এই বছর আর চাওমিংয়ের বিয়ে করা হলো না। বিয়ে তো দূরের কথা, ফসল পুড়ে যাওয়াতে নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেও হিমশিম খেয়ে গেল। ছোট বোনটার জন্য একটা শীতের গাউন দরকার ছিলো, সেটাও কেনা হলো না। এবারের শীতেও প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হবে, আদরের বোনটাকে। মাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করানো গেল না।

কিন্তু তার আত্মত্যাগ পুরো একটা গ্রামকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। গ্রামের লোকেরা তার এই ত্যাগ ভোলেনি। সে সবার আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সে প্রমাণ করতে পেরেছে, সে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে জানে। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে জানে। নিজের স্বার্থের চেয়ে অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে জানে।

চাওমিং গত বছর অন্যদের স্বপ্ন ও জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়েছিলো। পরের বছর একে একে তার স্বপ্নগুলো সত্যি হলো।

মুখের নেকাব

ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা। প্যারিসের দ্য গল বিমান বন্দরের পাশের সুপার মার্কেট। একজন হিজাব পরিহিত মহিলা মার্কেটে এলো। একটা কাপড়ের দোকানে গেলো। পছন্দের কাপড় কেনার পর ক্যাশে গেলো, দাম পরিশোধের জন্য।

তখন ক্যাশ সামলাচ্ছিল একজন আলজেরিয়ান মেয়ে। একদম খোলামেলা পোশাকের যুবতী। সে হিজাব পরা মহিলার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, অবজ্ঞার স্বরে, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো,

–এমনিতেই ফ্রান্সে অনেক সমস্যা। এখন আবার এই হিজাবের সমস্যা এসে যোগ হয়েছে। আমরা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি পয়সা কামানোর জন্য। ধর্ম আর ইতিহাস বিলোবার জন্য আসিনি। তুমি যদি ধর্ম পালন করতে চাও, হিজাব পরতে চাও নিজের দেশে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে যেভাবে ইচ্ছা ধর্ম পালন করো।

হিজাব পরা মহিলা তখন ব্যাগে সদ্য কেনা পণ্যগুলো ব্যাগে রাখছিলো। সেটা বন্ধ করে ক্যাশের মেয়েটির দিকে তাকালো। এরপর মুখের নেকাব উঠিয়ে রাখলো।

ক্যাশের মেয়েটি দেখলো, হিজাব পরা মানুষটি একজন ফরাসি মেয়ে। স্বর্ণকেশী। শাদা চামড়ার। নীলনয়না। মেয়েটি বললো,

–আমি বাবা-মা উভয় দিক থেকেই একজন ফরাসি। এটাই আমার জন্মভূমি। আর হিজাব; সেটা আমার ইসলাম। তোমরা তোমাদের দ্বীন বিক্রি করে দিচ্ছো। আমরা তা কিনে নিচ্ছি।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৭

চুরির শাস্তি

নিউ অরলিয়ন্স। আমেরিকার একটি রাজ্য। কৃষ্ণাঙ্গবহুল এলাকা। শহরের কোর্টে একজন আসামিকে হাজির করা হলো। এক কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধ। অপরাধ? লোকটা রুটি চুরি করেছে। বৃদ্ধটি চুরির কথা স্বীকার করলো। অস্বীকারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। বললো,

–ক্ষুধার যাতনা সহ্য করতে না পেরে আমি এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। ক্ষুধার তাড়নায় মরে যেতে বসেছিলাম। এ কাজ না করে আমার উপায় ছিলো না। বিচারক বললেন,

–আপনি কি জানেন, চুরির শাস্তি কী?

–জি, জানি।

– আপনি নিজেই চুরির কথা স্বীকার করেছেন। চুরির জন্য আপনাকে দশ ডলার জরিমানা করা হচ্ছে। জানি আপনার কাছে এই দশ ডলারও নেই। থাকলে তো আর চুরি করতেন না। তাই আমিই ওটা আদায় করে দিচ্ছি।

উপস্থিত দর্শকের মধ্যে নীরবতা ছেয়ে গেলো। তারা দেখলো বিচারক নিজের পকেট থেকে দশ ডলার বের করলেন। বেয়ারাকে বললেন, ডলারটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দিতে।

এরপর বিচারক উপস্থিত দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

–আপনাদের প্রত্যেকের উপরও দশ ডলার করে জরিমানা করা হলো। আপনাদের অপরাধ হলো, আপনারা এমন দেশে বাস করেন যেখানে একজন বৃদ্ধ লোক একটা রুটির জন্য চুরি করতে বাধ্য হয়।

সবার কাছ থেকে প্রায় পাঁচশ ডলার উঠলো। বিচারক সব টাকা বৃদ্ধকে দিয়ে দিলেন।

শায়খ শা'রাভি এই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এই বিচারক ইসলামের আদর্শকে ধারণ করেছে। এবং রাষ্ট্রকে একটা বার্তা দিতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি নাগরিকের সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

শায়খ আরো বলেন,

–কোনও মুসলিম দেশে কোন দরিদ্র লোক দেখলে বুঝে নেবে, আশেপাশেই কোনও ধনী আছে, যে এই গরিব লোকটার সম্পদ চুরি করেছে এবং যাকাত না দিয়ে আল্লাহর নাফরমানি করছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৮

শেয়ার বাজার

নূরপুর। চেঙ্গী নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটা গ্রাম। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা একটা নেহাত অজপাড়াগাঁ। এই গ্রামে একজন লোক এলো। এসেই সাড়ম্বরে ঘোষণা দিলো,

–আমি বিড়াল কিনবো। বিড়ালপিছু দশ টাকা করে দিবো।

গ্রামে হুটোপুটি পড়ে গেলো। সবাই দুয়েকটা করে বিড়াল বিক্রি করলো। পরে গ্রামবাসী দেখলো ইঁদুর ধরার জন্য দুয়েকটা বিড়াল থাকা দরকার। এবার তাদের বিড়াল বিক্রয়-উদ্যমে ভাটা পড়লো।

এবার ব্যবসায়ী ঘোষণা করলো প্রতিটি বিড়াল বিশ টাকা করে কিনবে।

আবার গ্রামবাসী নড়েচড়ে বসলো। সাড়া পড়ে গেলো। বাকি বিড়ালগুলোর অনেকগুলোই এই ধাক্কায় বিক্রি হয়ে গেলো। আবার গ্রামবাসী ইঁদুরের কথা মনে করে সচেতন হলো। বিক্রি বন্ধ করে দিলো।

এরপর ব্যবসায়ী ঘোষণা দিলো বিড়ালপিছু ত্রিশ টাকা করে দিবে।

এবার আর বিক্রির মতো বিড়াল খুব বেশি পাওয়া গেলো না। কয়েকটা বিড়াল বিক্রি হলো। তারপর আবার ইঁদুরের ভয়ে বিক্রি বন্ধ করে দিলো। এভাবে বিড়ালের দাম পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত উঠলো।

গ্রামবাসীদের কাছে আর কোন বিড়ালই পাওয়া গেলো না। আশেপাশের গ্রামেও কোন বিড়াল আর অবশিষ্ট নেই। পঞ্চাশ টাকা ঘোষণা দিয়েই সেই ব্যবসায়ী শহরে চলে এলো। এতদিন ধরে কেনা বিড়ালগুলোর দায়িত্ব এক সহকারীকে দিয়ে এলো।

সহকারী গ্রামবাসীর মাঝে ঘোষণা দিলো,

সে তাদের কাছে প্রতিটি বিড়াল পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি করতে রাজি। ব্যবসায়ী এলে তিনি তো প্রতিটি বিড়াল পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনবেন বলে ঘোষণা আগেই দিয়েছেন।

গ্রামবাসীরা এসে বিড়াল কিনতে ভেঙে পড়লো। স্ত্রীর অলংকার, জমানো টাকা ভেঙে সমস্ত বিড়াল কিনে নিলো। এরপর একদিন দেখা গেলো সেই সহকারী আর গ্রামে নেই। ব্যবসায়ী তো আগে থেকেই নেই। গ্রামবাসীর মাথায় হাত। এটা দেখে আশেপাশের গ্রামের মানুষদের টনক নড়লো।

জীবন জাগার গল্প : ১৫৯

শিমের বিচি

মজনুরা দুই পুরুষের ভিক্ষুক। বেশ বনেদি ফকিরই বলা যায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আজ ভিক্ষা শেষে দেখলো, কী এক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের অবস্থাপন্নরা মাছ-গোশত দিয়ে খাবার খাচ্ছে।

সে গজগজ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলো। সবাই ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে, শুধু আমিই কেন প্রতিদিন একই পচা খাবার গিলবো?

খেতে বসলো, জামিলা প্রতিদিনের মতো আজো পাটি বিছিয়ে দিলো। যত্ন করে খাবার বেড়ে দিলো। মজনুর মেজাজ খিঁচড়ে গেলো। আজো সেই একই খাবার। শীমের বিচি সেদ্ধ আর খড়খড়ে আটার রুটি। কিন্তু কী আর করা। যা আছে তা না খেয়ে তো উপায় নেই। খেয়ে দেয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে দেখলো, আরেকজন ফকির তাদের ফেলে দেয়া শীমের বিচির খোসাগুলোই কুড়িয়ে খাচ্ছে। ছোট মেয়েটাকেও খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে, মজনু লজ্জাও পেলো। মনে মনে দুঃখও পেলো। মনের ক্ষোভ তার দূর হলো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৬০

ফাঁসির রায়

স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর বিচার চলছে। নিম্ন আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আপিল হয়েছে।

আজ রায়ের দিন। আসামি পক্ষের উকিল ফাঁসির রায় ঠেকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে। উকিল উপস্থিত বিচারককে বললো,

–মাই লর্ড! ফাঁসির রায় তো পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই হয়ে থাকে। আমরা তো এখনো, মক্কেলের খুনি হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। এখন আমি আমার মক্কেলের নিরপরাধ হওয়ার ব্যাপারে শক্ত প্রমাণ হাজির করবো। আসলে মক্কেলের স্ত্রী মারা যায়নি, এখনো জীবিত আছে। এখনি সে আদালতে হাজির হবে।

উকিল কোর্টের দরজা খুলে ধরলো। উপস্থিত সবার দৃষ্টি দরজার দিকে গেলো। এমনকি মেয়েপক্ষের উকিলও সেদিকে তাকালো।

অনেকক্ষণ পার হওয়ার পরও কেউ প্রবেশ করলো না। উকিল বললো:

– মাই লর্ড! দেখলেন তো, সবাই দরজার দিকে তাকিয়েছে। সবাই ভেবেছে, মহিলাটা আসবে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, সবাই এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নয় যে আমার মক্কেল তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

উপস্থিত সবাই উকিলের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে লাগলো। এজলাসে পিনপতন নীরবতা। এখন রায় ঘোষণা করা হবে। বিচারক তার রায়ে বললেন,

–বিভিন্ন সাক্ষী-সাবুদ দেখে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, এই স্বামীই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

পরে বিচারককে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কিভাবে এত নিশ্চিত হলেন?

–এ তো সোজা! উকিল যখন বললো -এখন মৃত স্ত্রী দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে- সবাই দরজার দিকে তাকিয়েছে। শুধু একজন তাকায়নি। সে হলো স্বামী। কারণ, সে তো জানে তার স্ত্রী বেঁচে নেই। তাকে তো সে হত্যা করে ফেলেছে। মৃত মানুষ কবর থেকে উঠে আসতে পারে না।

জীবন জাগার গল্প : ১৬১

রাজার চার বিবি

রাজার চার স্ত্রী। চতুর্থজনকে তিনি পাগলের মতো ভালোবাসেন। তাকে খুশি করতে উদয়াস্ত ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তৃতীয় স্ত্রীকেও রাজা ভালোবাসে। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ, সুযোগ পেলে এই স্ত্রী তাকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চলে যাবে।

দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক যেমনই হোক। বিপদাপদে রাজা এই স্ত্রীর কাছে আসে। সঙ্গ উপভোগ করে। তার কাছে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে।

প্রথম স্ত্রীকে রাজা সবসময় অবহেলা করে। তার কোনও খোঁজ-খবর রাখে না। তার প্রাপ্য হক যথাযথ আদায় করে না। অথচ এই স্ত্রী রাজাকে অনেক ভালোবাসে। এই বিরাট রাজ্যের স্থিতি-অবস্থিতির পেছনে এই রাণীর বিরাট ভূমিকা আছে।

বার্ধক্যের কারণে রাজা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাজা বুঝতে পারলো তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। রাজা অনেক চিন্তা করলো। আমার তো চার রাণী আছে। আমি কবরে একা যেতে চাই না। চতুর্থ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো,

–আমি তোমাকে অন্য স্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি। তোমার সব চাওয়াই আমি পূরণ করেছি। কোনও সাধ অপূর্ণ রাখিনি। তুমি কি আমার সাথে কবরে যেতে রাজি আছো? কবরে আমাকে একটু সঙ্গ দেবে?

চতুর্থ রাণী বললো: অসম্ভব। এই বলে দ্রুত গতিতে কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে গেলো। রাজার প্রতি কোনও রকমের সহানুভূতি দেখালো না।

রাজা তৃতীয় স্ত্রীকে ডেকে বললো,

–আমি তো সারা জীবন তোমাকে ভালোবেসে গেলাম। তুমি কি আমার কবরে আমাকে সঙ্গ দিবে?

– নাহ! জীবনটা একটা সুন্দর বস্তু। আপনার মৃত্যুর সাথে সাথেই আমি আরেকজনকে বিয়ে করে ফেলবো। আপনার সাথে কবরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

রাজা দ্বিতীয় বিবিকে ডেকে পাঠালো।

–বিপদাপদে সবসময় তোমার কাছেই আশ্রয় নিয়েছি। তোমার পরামর্শ চেয়েছি। তুমিও আমাকে সঙ্গ দিয়েছো। সাহায্য করেছো। এখন বলো তো তুমি কি কবরে আমার সঙ্গে থাকবে?

–আমাকে ক্ষমা করবেন। এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বেশির থেকে বেশি; আপনার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে পারি। আপনাকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।

রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। স্ত্রীদের নিমকহারামি তাকে বড়ই কষ্ট দিলো। হঠাৎ দূর থেকে একটা আওয়াজ এলো, আমি থাকবো। আপনি যেখানে যান আমিও যাবো আপনার সাথে।

রাজা তাকিয়ে দেখলেন, তার প্রথমা স্ত্রী। অত্যন্ত শীর্ণকায়, দুর্বল, অসুস্থ। তিনি বুঝতে পারলেন, তার অবহেলার কারণে আজ প্রথমা স্ত্রীর এই অবস্থা হয়েছে। রাজা অনুতপ্ত হলেন। জীবদ্দশায় তার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করে ফেলেছেন। তাকে বললেন,

–আমার উচিত ছিলো তোমাকে গুরুত্ব দেয়া। অন্যদের চেয়ে আলাদা চোখে দেখা। যদি সুস্থতা ফিরে পাই, তাহলে তোমাকে নিয়ে জীবনটা আবার সুন্দর করে সাজাবো। অন্যদের তুলনায় তোমাকেই গুরুত্ব বেশি দেবো।

আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই চারজন স্ত্রী আছে। চতুর্থ স্ত্রী হলো আমাদের শরীর। আমরা শরীরকে যতই গুরুত্ব দিই, যত্ন নিই, তৃপ্ত করি; মৃত্যুর সাথে সাথেই শরীর আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে।

তৃতীয় স্ত্রী হলো ধন-সম্পদ। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদেরকে ছেড়ে অন্যজনের কাছে চলে যাবে।

দ্বিতীয় স্ত্রী হলো আমাদের পরিবার-পরিজন। বন্ধু-বান্ধব। জীবদ্দশায় তারা যতই আমাদের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করুক; মৃত্যুর পর আমরা তাদের কাছে খুব বেশি কিছু আশা করতে পারি না। তারা বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু করবে; আমাদেরকে কবর পর্যন্ত সঙ্গ দেবে।

প্রথমা স্ত্রী হলো আমাদের নেক আমল। আমরা এটার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে উদাসীন থাকি। ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধবের চেয়ে এটাকে বেশি গুরুত্ব দেই না। অথচ এটাই একমাত্র বস্তু যেটা আমাদের সাথে কবরে যাবে।

আজ যদি আমাদের আমলনামা আমাদের সামনে একজন মানুষের ছবি ধরে দাঁড়ায়, কেমন হবে তার আকৃতি? শীর্ণকায়, দুর্বল আর অবহেলিত? নাকি শক্তিশালী, পরিশীলিত আর সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত?

জীবন জাগার গল্প : ১৬২

কুকুরের চিকিৎসা

জন হপকিন্স হসপিটাল। নিউইয়র্ক। বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক পল এডাম গাড়ি চালিয়ে এক জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য আসছেন। পথিমধ্যে দেখলেন একটা কুকুর আহত হয়ে পড়ে আছে। ছটফট করছে। সামনের একটা পা ভেঙে গেছে।

তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। কুকুরটাকে হাসপাতালে নিয়ে প্লাস্টার করে দিলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর একদিন ডাক্তার এডাম বাড়ির বাগানের গাছে পানি দিচ্ছিলেন। এমন সময় শুনলেন, একটা কিছু তার বাড়ির প্রধান ফটকে ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখলেন, সেদিনের কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। সেটার সাথে আরেকটা কুকুরও আছে। সাথের কুকুরটির একটা পা ভাঙা। রক্ত বের হচ্ছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৩

চোর বিড়াল

ওমায়ের একটা বিড়াল পোষে। বিড়ালটাকে গোসল করায়। নিজ হাতে খাওয়ায়। আদর করে। গা ডলে দেয়। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এতকিছুর পরও বিড়ালটা খাবার চুরি করে। তাকে পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হলেও চুরি করে।

একদিন ওমাইর ঠিক করলো বিড়ালটাকে চোখে চোখে রাখবে। দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন বিড়াল টা চুপিচুপি রান্না ঘরে প্রবেশ করলো। ওখান থেকে একমুখ এঁটো খাবার তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে বের হলো।

ওমায়েরও বিড়ালের পিছু নিলো। সে দেখলো তার বিড়ালটা তাদের গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখলো, তার পোষা বিড়ালটা অন্য আরেকটা বিড়ালের সামনে খাবারটা রাখছে। ওমাইর কাছে গিয়ে দেখলো, সেই বিড়ালটা অন্ধ।

সে অবাক হয়ে ভাবলো, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তার মাখলুকের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন!

জীবন জাগার গল্প : ১৬৪

জুতার ইতিকথা

বিশাল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজা চলছেন। পাশের রাজ্য দখলের জন্য। পথে পড়ল বিজন ঊষর মরুভূমি। এতদূরের পথ হেঁটে রাজার পা ফুলে ঢোল হয়ে গেলো। আগুনের মতো গরম বালুর ছেঁকায় সৈন্যদের অবস্থাও বেশ কাহিল। দুয়েক জায়গায় ফেটে রক্তও ঝরছে।

রাজা হুকুম দিলেন যে পথ দিয়ে তিনি এসেছেন, পুরো পথটা চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে ফেলতে। ফিরতি পথে যাতে সৈন্যদের কষ্ট না হয়। একজন মন্ত্রী বলল,

–জাহাঁপনা! এর চেয়েও সহজ ব্যবস্থা আছে।

–কী সেটা?

–আমরা এতবড় আর দীর্ঘ রাস্তা চামড়া দিয়ে না মুড়িয়ে, আমাদের প্রত্যেকের পা-কে চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে নিলেই কাজটা সহজে সারা হয়ে যাবে।

– আরে তাই তো! ঠিক আছে তাই করো।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৫

ভালোবাসা-সম্পদ-সফলতা

স্বামী অফিসে চলে গেছেন। বাসার সামনের টবগুলোতে পানি দেয়ার জন্য স্ত্রী বের হলেন। দেখলেন গেইটের বাইরে তিনজন বৃদ্ধলোক বসে আছেন। তিনজনেরই দীর্ঘ সফেদ দাড়ি।

স্ত্রী বললেন,

–আপনাদেরকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না? আপনারা বোধহয় ক্ষুধার্ত। দয়া করে ভেতরে আসুন; আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি।

–আপনার স্বামী কি বাসায় আছেন?

–জি না, তিনি তো অফিসে।

–তাহলে আমরা ভেতরে যাবো না।

সন্ধ্যায় স্বামী ঘরে ফিরলেন। স্ত্রী সকালের ঘটনা খুলে বললেন।

–বলো কি? যাও তো, তাঁরা এখনো আছেন কি না, কই আমি আসার সময় তো দেখলাম না? স্ত্রী গিয়ে দেখলেন তিন বৃদ্ধ সকালের মতোই জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন।

–আপনারা ভেতরে আসুন। আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরেছেন।

–আমরা তো একসাথে ঘরে ঢুকতে পারবো না।

–কেন?

–আমাদের একজনের নাম সম্পদ। আরেকজনের নাম সফলতা। আরেকজনের নাম ভালোবাসা। আপনি ঘরে ফিরে যান; আপনার স্বামীর সাথে পরামর্শ করুন। আমাদের তিনজনের মধ্য থেকে কাকে চান, সেটা ঠিক করে আসুন।

স্ত্রী ঘরে এসে স্বামীকে জানালেন। স্বামী সব শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন,

–কী সৌভাগ্য! আমাদের সম্পদ ছাড়া আর কিছু লাগবে না। তুমি গিয়ে সম্পদকে ডেকে নিয়ে আসো। আমাদের ঘরটা সম্পদে ভর্তি হয়ে যাক।

স্ত্রী বললেন,

–সফলতাকে ডেকে আনলে ভালো হতো না?

অদূরে পুত্রবধু ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিলো। সে শ্বশুর-শাশুড়ির কথোপকথন শুনছিলো। সে প্রস্তাব দিলো,

–আব্বু! আমার তো মনে হয় ভালোবাসাকে ডেকে পাঠালেই সবচেয়ে ভালো হয়। আমাদের ঘরটা ভালোবাসায় ভরে যাবে। সুখ-শান্তিতে ঝলমল করবে।

–ঠিক বলেছো বৌমা। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করলাম।

ওগো! এবার যাও, ভালোবাসাকে ডেকে নিয়ে এসো। স্ত্রী গিয়ে বৃদ্ধদেরকে বললেন,

–আপনাদের মধ্যে ভালোবাসা কে?

–এই যে আমি।

–আসুন। আমরা আপনাকেই মেহমান হিসেবে গ্রহণ করবো।

একজন বৃদ্ধলোক উঠে হাঁটা দিলো। মহিলাটি অবাক হয়ে দেখলো, বাকি দুই বৃদ্ধও পিছু পিছু হাঁটা দিয়েছে।

--কী ব্যাপার? আমি তো শুধু ভালোবাসার বৃদ্ধকে দাওয়াত দিয়েছি। আপনার দুজন কেন আসছেন?

–আমরা দুজন আসলে ভালোবাসার অনুগামী। ভালোবাসা যেখানে যায়, আমরা সম্পদ-সফলতাও সেখানে যাই। কিন্তু আমরা (সম্পদ-সফলতা) একা একা যেখানে যাই ভালোবাসা সেখানে যায় না।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৬

দৃষ্টিশক্তি

নাফীসা কিরমাযি। তিউনিশিয়ার কিরমায অঞ্চলের বাসিন্দা। তিন সন্তানের জননী। বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই। দুই বছর আগে কূপ থেকে পানি তুলতে গিয়ে আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যান। কূপের শান বাঁধানো পাড়ের সাথে লেগে মাথাটা ফেটে যায়। সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। তিন ছেলে ধরাধরি করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। কর্তব্যরত চিকিৎসক অনেক চেষ্টা-তদবির করে তার হুঁশ ফিরিয়ে আনলেন। সমস্যা হলো অন্য জায়গায়। হুঁশ ফিরে পাওয়ার পরই নাফীসা জিজ্ঞেস করলেন, এখন রাত কয়টা বাজে?

বড় ছেলে যিহাম বললো, আম্মু এখন দুপুর বারোটা বাজে।

–তাহলে আমার কাছে চারপাশ এমন অন্ধকার লাগছে কেন? বাতি জ্বালিয়ে দাও। জানালা খুলে দাও।

– আম্মু জানালা তো খোলা। একথা বলে যিহাম ডুকরে কেঁদে উঠলো। আম্মু বোধহয় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েই ফেলেছেন। সাথে সাথে ছোট ছেলে রাবাব ছুটলো ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, মাথায় আঘাতের কারণে, শরীরের কোনও নার্ভে সমস্যা হয়েছে। আপনারা পাশের শহর যিন্দালে নিয়ে যান। ওখানে বড় চক্ষু হাসপাতাল আছে। বড় একজন ফরাসি ডাক্তারও আছেন।

যিহাম একটা এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে মাকে নিয়ে যিন্দালে গেলো। এখানে তার শ্বশুর বাড়ি। স্ত্রী রাকামাহ এখন বাপের বাড়িতেই আছে। মায়ের দেখাশোনায় কোনো সমস্যা হবে না।

হাসপাতালের ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। কিন্তু কিছুই ধরতে পারলেন না। পুরো শরীর একদম সুস্থ। তারা অপারগতা প্রকাশ করে রোগিনীকে ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন।

যিহাম মাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। কয়েক মাস পর। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আম্মু যিহামকে ডেকে পাঠালেন।

–কী আম্মু! ডেকেছেন?

–হ্যাঁ, আমি হজ্জ করবো। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করো। টাকাপয়সার তো সমস্যা হবে না। আর তোমাদের কাউকে সাথেও যেতে হবে না। ওখানে তো তোমাদের মেজো মামা আছে। সেই আমার দেখাশোনা করতে পারবে।

–আম্মু, হঠাৎ করে হজ্জ করার ইচ্ছা হলো কেন?

–ইচ্ছা হঠাৎ করে হয়নি। ইচ্ছা তো সবসময়ই ছিলো। কিন্তু এখন, এ অবস্থায় ইচ্ছা হওয়ার পেছনে অন্য কারণ আছে।

–কী কারণ?

–গত কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখেছি, আরাফাতের ময়দানে ছোটাছুটি করছি। আর আনন্দে হাসছি। আমার চোখের কোনও সমস্যা ছাড়াই। স্বপ্নে আমি নিজেকে অন্ধ দেখিনি। মনে হচ্ছে, হজ্জে গেলে বোধ হয় আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবো।

–ঠিক আছে, আম্মু। আমি শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি।

নাফীসা কিরমাযি হজে এলেন। শুরু থেকেই আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দু'আ করতে থাকলেন। সারাক্ষণই দু'আ ইস্তিগফারের উপর থাকলেন। হজ্জ শুরু হলো। আরাফাতের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিলো, তার উত্তেজনা ততই বাড়ছিলো। ছোট ভাই সারাক্ষণই বোনকে আগলে আগলে রাখছে। জন্মগত অন্ধ হলে না হয় কথা ছিলো। সদ্য দৃষ্টিহীন হওয়ায় বোনের চলাফেরাটা এখনো সাবলীল হয়নি। তাই সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়।

নাফীসা আরাফাতের আগের রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিলেন। জায়নামায ছেড়ে ওঠেননি, বলতে গেলে। সময়মতো গাড়ি এলো। ভাইয়ের হাত ধরে আরাফাতের ময়দানে পৌঁছলেন। সম্মিলিত দু'আ শুরু হলো।

নাফীসা পুরো দু'আতেই চোখ বন্ধ করে থাকলেন। দু'চোখের পানিতে তার জামাকাপড় ভিজে গেলো। পাশে ছিলো অস্ট্রিয়ান এক নওমুসলিম মহিলা। নাফীসার কান্না দেখে, অস্ট্রিয়ান মহিলা মুনাজাত বাদ দিয়ে, নাফীসাকে ধরে কাঁদতে শুরু করে দিলো।

একসময় মুনাজাত শেষ হলো। নাফীসা ভয়ে ভয়ে চোখ খুললো। আল হামদুলিল্লাহ বলেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এমন বাঁধভাঙা কান্নার গমকের মাঝেও নাফীসার মুখে ছিলো অমলিন হাসি।

আল্লাহ তা'আলা তার এতদূর আসাকে বৃথা যেতে দেননি।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৭

তিন উজিরের সংগ্রহ

ওয়াজ চলছে। একটা কাজে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। কান খোলা ছিলো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। হুযুর একটা গল্প বলছেন।

রাজা তার তিন উজিরকে ডেকে বললেন,

–এই নিন থলে। বাগানে গিয়ে নিজের ইচ্ছামতো ফলমূল দিয়ে যার যার থলে ভর্তি করে নিয়ে আসুন। থলেগুলো যথেষ্ট বড়ো। ব্যাগগুলো ভর্তি করতে অন্য কারো সাহায্য নেয়া যাবে না। এমনকি নিজেরাও একে অপরকে সাহায্য করতে পারবেন না।

তিন উজির এই অদ্ভুত আদেশে অবাক হলেও কিছু বললো না। বাগানে চলে গেলো।

প্রথম উজির মনে মনে ভাবলো,

–রাজামশাই যেহেতু আদেশ করেছেন, নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। হয়তো তার রাজপ্রাসাদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশ্বস্ত কারো দ্বারা ফল সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

উজির বাগানে ঘুরে ঘুরে ভালো ভালো ফলমূল দ্বারা ব্যাগ ভর্তি করলো।
দ্বিতীয় উজির ভাবলো,
–আমি নিশ্চিত, রাজা আমাদের থলে খুলে দেখতে যাবেন না। তার তো ফলের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন থাকলেও ফল সংগ্রহের মানুষের অভাব নেই। উজির সামনে যা পেলো তাই তুলে নিলো। পচা-ধচা ফলে তার ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেলো।
তৃতীয় উজির ভাবলো,
–আমাদের ব্যাগ খুলে পরীক্ষা করতে রাজার বয়েই গেছে। রাজা বাগান থেকে কুড়িয়ে নেয়া ফল খেতে যাবেন কেন? রাজাদের কত রকমের উদ্ভট খায়েশই না জাগে! উজির ঘাস-লতা দিয়েই ব্যাগ ভর্তি করে ছায়ায় বসে, দুলে দুলে হাওয়া খেতে লাগলো।
পরদিন রাজা তিন উজিরকে তাদের ব্যাগসহ দরবারে তলব করলেন। তিন উজির দরবারে হাযির হলে সৈন্যদেরকে হুকুম দিলেন,
–এই তিনজনকে গ্রেফতার করো। কারাগারের নির্জনতম প্রকোষ্ঠে এদেরকে আলাদা আলাদা করে বন্দী করে রাখো। এক মাস পর এদেরকে দরবারে হাযির করবে। আমার একজন বুদ্ধিমান আর বিশ্বস্ত উজির দরকার। দেখি এদের তিনজনের কেউ হতে পারে কি না।
জেলে গিয়ে প্রথম উজির তার থলের ফলগুলো বের করে রাখলো। কিছু শুকিয়ে রেখে দিবে। আর কিছু কাঁচা খাবে। এভাবে অনায়াসেই এক মাস পার হয়ে যাবে।
দ্বিতীয় উজির দেখলো সে বাছবিচার না করেই ফল দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করাতে, এখনি কিছু ফলে পচন ধরেছে। তাড়াতাড়ি ফলগুলো বেছে বেছে, ভালোগুলো আলাদা করে রাখলো। বুঝেশুনে চলতে পারলে অতি কষ্টেসৃষ্টে এক মাস কোনোরকমে পার হয়ে যাবে।
তৃতীয় উজির তো কোনও ফলই ব্যাগে নেয়নি। দুয়েকটা যাওবা নিয়েছে, সেগুলো দুএকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর কি, না খেয়ে মরা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।
রাজা তো বলেই দিয়েছেন, এই এক মাস কোনও রকমের খাবার দেয়া হবে না।

এবার ওয়াজকারী হুযুর বললেন,

তিন উজিরের মতো আপনিও দুনিয়ার বাগানে আছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ফল (নেক আমল) কুড়ানোর জন্য থলে (হায়াত) দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আপনি চাইলে প্রথম উজিরের মতো শুধুই ভালো ভালো ফল (নেক আমল) দিয়ে থলে (জীবন) ভরিয়ে তুলতে পারেন।

অথবা দ্বিতীয় উজিরের মতো ভালো-মন্দ উভয় প্রকার ফল (নেক ও বদ আমল) দিয়ে থলে ভর্তি করতে পারেন।

অথবা তৃতীয় উজিরের মতো শুধুই খড়কুটো (বদ আমল) দিয়ে থলে ভর্তি করতে পারেন।

মনে রাখবেন, যে ফল দিয়ে থলে ভর্তি করবেন আখিরাতে সেভাবে ফলভোগ করবেন।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৮

বেদুইনের বাকচাতুর্য

ডাকাত এসে এক বেদুঈনের সবকিছু ডাকাতি করে নিয়ে গেলো। বেদুঈন কোনো উপায়ান্তর না দেখে খলীফা মামুনের দরবারে এলো। নালিশ জানাবে। বেদুইনের বেশ-ভূষা দেখে প্রহরীরা তাকে দরবারে ঢুকতে বাধা দিলো। নানাভাবে চেষ্টা করেও সে দরবারে প্রবেশের কোনো রাস্তা বের করতে পারলো না।

বেদুঈন হাল ছাড়লো না। এভাবে রাজপ্রাসাদের দরজায় দরজায় ঘুরেই একটা বছর কাটিয়ে দিলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে একটা কৌশল বের করলো।

সে জুমার দিন বাগদাদের জামে মসজিদের সামনে গিয়ে, খুতবার ঠিক আগ মুহূর্তে চিৎকার করে বলতে লাগলো:

–হে বাগদাদবাসী! আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। বোঝার চেষ্টা করো। সাক্ষী থাকো,

–আমার এমন জিনিস আছে যা আল্লাহর নেই।

–আমার কাছে এমন বস্তু আছে যা আল্লাহর কাছে নেই।
–আমার কাছে এমন বস্তু আছে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।
–আমি 'ফিতনা' ভালোবাসি, আর 'হক'কে অপছন্দ করি।
–আমি যা দেখি না সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেই।
–আমি ওযু ছাড়াই সালাত আদায় করি।

আশেপাশের মানুষ তার এসব উল্টাপাল্টা বক্তব্য শুনে পাকড়াও করলো। তাকে সৈন্যদের হাতে সোপর্দ করলো। পরদিন তাকে দরবারে হাযির করা হলো। খলীফা মামুন তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

–তোমার ব্যাপারে যা শুনলাম তা কি সত্যি?

–জি।

–কেন এসব উল্টাপাল্টা বকা শুরু করেছো?

–আমীরুল মুমিনীন! আমার ধন-সম্পদ, মাল-সামানা সব ডাকাতি হয়ে গেছে। বিচার নিয়ে আপনার দরবারে এসেছিলাম। প্রহরীরা ঢুকতে দেয় নি। আমি একটা বছর প্রাসাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে সুযোগ খুঁজেছি। কাজ হয়নি।

শেষে কোনও উপায় না দেখে এই কৌশল অবলম্বন করেছি। যাতে সহজেই আপনার সামনে আসতে পারি এবং আপনার কাছে সরাসরি ফরিয়াদ জানাতে পারি এবং আমার ধন-সম্পদ ফিরে পেতে পারি।

–ঠিক আছে তোমার সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেয়া হবে। তার আগে তুমি বক্তব্যের ব্যাখ্যা করো।

–ঠিক আছে। আমি বলেছি, আমার এমন জিনিস আছে যা আল্লাহর নেই।

= আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, আল্লাহর নেই।

– আমি বলেছি; আমার কাছে এমন বস্তু আছে যা আল্লাহর কাছে নেই।

= আমার কাছে মিথ্যা-ধোঁকা আছে, এটা আল্লাহর কাছে নেই।

– আমার কাছে এমন বস্তু আছে, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।

= আমি কুরআনে হাফেয। কুরআন কোনও সৃষ্ট বস্তু মানে মাখলুক নয়, কুরআন অসৃষ্ট (গাইরে মাখলুক)।

(মামুন একথা শুনে রেগে গেলেও কিছু বললেন না। কারণ মামুন খালকে কুরআন আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এবং মু'তাযিলারা মনে করতেন কুরআন কারীম আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। আর আহলে হক বিশ্বাস করেন; কুরআন কারীম কোনও সৃষ্ট বস্তু নয়। কুরআন কারীম অনাদি। আল্লাহ তা'আলার নয়টা ওয়াসফ বা বৈশিষ্ট্যের একটা হলো 'কালাম'। বলাবাহুল্য যে কোনও গুণই তার মূলসত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে। আলাদা থাকে না। তদ্রুপ কুরআন বা কালামুল্লাহও আল্লাহর ওয়াসফ বা গুণ। তাই যখন থেকে আল্লাহ আছেন, তখন থেকে কুরআনও আছে।)

–আমি বলেছি; আমি 'ফিতনা' ভালোবাসি, আর 'হক'কে অপছন্দ করি।

= আমি সম্পদ ও সন্তানকে ভালোবাসি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ দুটি বস্তুকে 'ফিতনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আর হককে অপছন্দ করি বলেছি; মৃত্যুর আরেকটি নাম হলো হক। আর মৃত্যুকে কে না অপছন্দ করে?

–আমি বলেছি; আমি যা দেখি না সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দেই।

= আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এটা আমি না দেখেই সাক্ষ্য দেই।

–বলেছিলাম; আমি ওযু ছাড়াই সালাত আদায় করি।

= আমি রাসূলের প্রতি ওযু ছাড়াই সালাত (দুরূদ) পাঠাই। কারণ দুরূদ প্রেরণ করতে ওযুর প্রয়োজন নেই। বলাবাহুল্য সালাত শব্দটার আরেক অর্থ দুরূদ।

খলীফা মামুন বেদুইনের ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলেন। তাকে তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে বললেন।

জীবন জাগার গল্প : ১৬৯

দার্শনিক গাধা

এক কৃষকের অনেকগুলো গাধা। গাধাগুলো অনেক কাজের। বলতে গেলে কৃষকের সব কাজ গাধারাই করে। একদিন দেখা গেলো একটা গাধা সকাল থেকে কিছু মুখে দিচ্ছে না। দুপুর হলো কিছু মুখে দিলো না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, কিছু মুখে দিলো না। সন্ধ্যা নাগাদ গাধাটা দুর্বল হয়ে পড়লো। রাত নেমে এলো। কিছুই খেলো না। এভাবে না খেয়ে থাকলে বেশিক্ষণ টিকবে না। রাত গভীর হলে অনশনরত গাধাটার বাপ তার কাছে এলো।

–কিরে বাছা! কী হয়েছে তোর? আমাকে খুলে বল। কেন অনশনে গেলি? নে খেয়ে নে, এই দেখ তোর জন্য কত ভালো যব এনেছি।

–না আব্বু, খাবো না।

–কেন কী হয়েছে আমাকে খুলে বল। তোকে কেউ মেরেছে?

–না আব্বু, আমাকে কেউ মারেনি। কিন্তু আমি খেতে চাচ্ছি না মানুষের কারণে।

পিতা গাধা অবাক হয়ে জানতে চাইলো,

–মানুষের কারণে? তারা আবার কী করলো?

–তারা আমাদেরকে উপহাস করে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। কোনো মানুষ খারাপ কাজ করলে তাকে অন্যরা গাধা বলে গালি দেয়। কোনও ছোট ছেলে খারাপ কাজ করলে, দুষ্টুমি করলে বাবা-মা তাকে গাধা ছেলে বলে ডাকে।

তারা বোকা লোকদের গাধা বলে সম্বোধন করে। কিন্তু আব্বু, আমরা তো তেমন নই। আমরা কোনো ক্লান্তি ছাড়াই কাজ করে যাই। কাজে কোনও রকমের ফাঁকি দেই না। অলসতা করি না। ধোঁকা দেই না।

আমাদের প্রতি তারা যে হেয় আচরণ করে, উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করে আমরা কি সত্যিই এত নীচ? আমাদেরও তো মন আছে। আবেগ-অনুভূতি আছে। মান-অপমানবোধ আছে।

পিতা গাধা মহা মুশকিলে পড়ে গেলো। কিভাবে তার এই জেদী আর অভিমানী ছানাটাকে বোঝাবে? সে যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করলো সেগুলো তো শতভাগ সত্যি। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে পিতাগাধা বললো,

–দেখ! মানুষ হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব। আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকূলের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এতকিছুর পরও তারা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়।

তুই অভিযোগ করছিস, মানুষ আমাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তারা এই অন্যায় আচরণ শুধু যে আমাদের প্রতি করেছে তা কিন্তু নয়। তারা প্রথমে নিজেদের প্রতিই অন্যায় করেছে। উদাহরণস্বরূপ দেখ,

–তুই কি জীবনে কোন গাধাকে তার ভাইয়ের সম্পদ চুরি করতে দেখেছিস?

–কোন গাধাকে অন্য গাধার সম্পদ লুণ্ঠন করতে দেখেছিস?

–তুই কি কোন গাধাকে অন্য গাধার খাবার ছিনিয়ে নিতে দেখেছিস?

–কোন গাধাকে কি অন্য গাধা সম্পর্কে অভিযোগ করতে দেখেছিস?

–তুই কি দেখেছিস একটা গাধা অন্য গাধাকে গালি দেয়?

–কোন গাধাকে তার স্ত্রী-পুত্রকে মারতে দেখেছিস?

–তুই কোন গাধাকে আত্মহত্যা করতে দেখেছিস?

–কোন গাধাকে দল পাকাতে দেখেছিস?

–তুই কোন মেয়ে গাধাকে রাস্তাঘাটে নির্লজ্জ-বেহায়ার মতো ঘুরতে দেখেছিস?

–তুই কখনো শুনেছিস যে, যব, গম বা ঘাসের জন্য আমেরিকান গাধাগুলো আরব গাধাগুলোকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে? অথবা একপাল সিরিয়ান গাধা আরেকপাল সিরিয়ান গাধাকে ব্যারেল বোমা মেরে পাইকারী হারে হত্যা করছে?

অবশ্যই তুই এ ধরনের গাধাইয়া অপরাধের কথা শুনিসনি। তাহলে আমার একান্ত কামনা হলো,

–তুই তোর গাধাইয়া মেধাকে কাজে লাগা।

আমি চাই গাধাইয়া সমাজে তুইও মাথা উঁচু করে বাস করবি, আমার মাথাটা উঁচু রাখবি। বাছা আমার! একজন গাধাপুত্র গাধা হিসেবেই বেঁচে

থাকার প্রতিজ্ঞা কর। মানুষের কথা ছেড়ে দে। তারা যা ইচ্ছা তাই বলুক। আমাদের গর্বের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা কাউকে হত্যা করি না। চুরি করি না। অন্যের গীবত করি না। সম্পদ লুণ্ঠন করি না।

পুত্র গাধা বাবার এই দীর্ঘ নসীহত শুনে ভীষণ প্রভাবিত হলো। তড়াক করে দাঁড়িয়ে বাবার নিয়ে আসা যব খেতে শুরু করে দিলো।

বাবাকে এই বলে বিদায় দিলো:

–আব্বু! আপনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে বাঁচবো। একজন গাধার পুত্র গাধা হিসেবে শির উঁচু করে বাঁচবো।

জীবন জাগার গল্প : ১৭০

গোশত সিদ্ধ

বাড়িতে মেহমান এলো। গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি বাজারে গেলো বাজার আনতে। কাঁচাবাজার করা শেষ করে দুই কেজি গোশতও কিনল।

এমন সময় জুমার আযান হলো। লোকটা বাড়ি না গিয়ে মসজিদে চলে গেলো। বাজার থেকে ঘর অনেক দূরে। সদাইপাতি দিয়ে আসতে গেলে জুমা পাওয়া যাবে না।

লোকটা ধীরস্থিরভাবে আগাগোড়া সব নামায পড়লো। গোশতের থলেটা সে রেখেছিলো এয়ারকুলারের একদম কাছে নিয়ে। ঠাণ্ডায় যাতে কিছুটা হলেও গোশতগুলো তাজা থাকে।

নামায শেষ হলে সওদা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলো। এমনিতে দেরি হয়ে গেছে। মেহমানকে বোধহয় সময়মতো খাবার পরিবেশন করা যাবে না।

স্ত্রী ঝটপট গোশত কুটে রান্না চড়িয়ে দিলো। তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হওয়ার জন্য গোশতটা প্রেশার কুকারে দিলো। নির্দিষ্ট সময়ের পর ঢাকনা উল্টিয়ে দেখলো গোশত আগের মতোই রয়ে গেছে। ঢাকনা বন্ধ করে আবার সেদ্ধ দিলো।

নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর, ঢাকনা উল্টিয়ে দেখলো আগের মতোই রয়ে গেছে। গোশতের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

রেগেমেগে স্ত্রী বললো,

–কী গোশত এনেছেন, সেদ্ধই হচ্ছে না। ঘরে মেহমান বসে আছেন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখন আবার এই ফ্যাসাদ! স্বামী এসে আরেকবার চেষ্টা করে দেখলো। উঁহু কিছুই হলো না। কারণ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ স্বামীর মনে পড়লো, আজ ইমাম সাহেব নামাযের পর দু'আ করেছেন;

–ইয়া আল্লাহ! যারা এই মসজিদে উপস্থিত আছে, তাদের উপর আগুনকে হারাম করে দিন। এই গোশতগুলোও তো তখন মসজিদে ছিলো।

স্ত্রীকে ঘটনাটা খুলে বললো।

–এই গোশত আর সেদ্ধ হবে না।

স্ত্রী অবাক হয়ে বললো, আপনিও তো ছিলেন?

স্বামীর দু'চোখ বেয়ে তখন আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে শুরু করলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৭১

শিল্পী

উস্কখুস্ক চুলের এক লোক। দেখলেই বোঝা যায় একজন প্রতিভাবান। ফটক খুলে বের হলো। বাসার সামনে বিপরীত পাশের মুদি দোকান থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনলো। দোকানের বৃদ্ধা মালকিন সবকিছু একটা প্যাকেটে বেঁধে দিলো।

লোকটি একশ ডলারের একটা নোট দিলো। বৃদ্ধা নোটটা ক্যাশে রেখে দিলো। লোকটা চলে গেলো। বৃদ্ধা লক্ষ করলো হাতে কালি লেগে আছে। হাতটা আগে থেকে ভেজা ছিলো। বৃদ্ধা ভাবতে লাগলো,

–কালিটা কোত্থেকে যে লাগলো?

ক্যাশ খুলে দেখলো, একটু আগে লোকটা একশ ডলারের যে নোট দিয়েছে সেখান থেকে কালিটা লেগেছে। বৃদ্ধা নোটটা ভালো করে লক্ষ্য করলো, নকল বলে কোনও আলামতই বোঝা যাচ্ছে না। আর লোকটাকে দেখে মনে হয় সম্পদশালী লোক। এত বড় বাড়িতে থাকে। এমন লোক তো

জালিয়াতি করতে পারে না। তবুও বৃদ্ধার মন থেকে খুঁতখুতে ভাব দূর হলো না। গরিব মানুষ। তার প্রতিটি টাকাই হিসেবের।

বৃদ্ধা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করলো। পুলিশ এসে টাকাটা পরীক্ষা করলো। পুলিশও দেখে কোনও খুঁত বের করতে পারলো না। অদ্ভুত রকমের মিল। কিন্তু সন্দেহ উদ্রেককারী বিষয় হলো, নোটটা থেকে সামান্য কালি উঠছে। এছাড়া আর কোনও বিষয় নেই যা দেখে বোঝা যাবে নোটটা জাল।

পুলিশ অফিসার বললেন,

–এই নোট যদি জাল হয়, তাহলে এর শিল্পী পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এত নিখুঁতভাবেও যে ছবি আঁকা যায় না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে লোকটার বাসায় হানা দিলো। অনেক অনুসন্ধানের পর একটা গোপন প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হলো। সেখানে পাওয়া গেলো অনেকগুলো জাল টাকা। আরো পাওয়া গেলো অপূর্ব তিনটা শিল্পকর্ম। নিচে শিল্পীর স্বাক্ষরও আছে।

পুলিশ শিল্পকর্ম তিনটা বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলো। সেগুলো নিলামে বিক্রি করে দিলো। তিনটা শিল্পকর্ম ষোল হাজার ডলারে বিক্রি হলো।

এত চড়া মূল্যে ছবিগুলো বিক্রি হতে দেখে শিল্পী লোকটা বেশ অবাক হলো। পাশাপাশি বিষণ্ণও হলো। কারণ একশ ডলারের একটা নোট জাল করতে যতক্ষণ সময় লাগে, একটা ছবি আঁকতেও তার ঠিক অতটা সময়ই লাগে। তাহলে সে তো ছবি বিক্রি করেই অনেক টাকা রোজগার করতে পারতো। কেন যে টাকা জাল করতে গেলো?

লোকটার আসলেই একটা প্রতিভা ছিলো। সে প্রতিভা নষ্ট করছিলো টাকা জাল করার পেছনে। সে নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে ছবি আঁকলে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারতো।

জীবন জাগার গল্প : ১৭২

শয়তানের সাহায্য

–ওগো শুনছো! ওঠো, ফজরের আযান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওযু করো। মসজিদে যাও।

–ইয়া আল্লাহ! আঁ আঁ আঁ। কয়টা বাজে?

–কয়টা বাজে বললে তুমি আবার শুয়ে পড়বে। উঠো, ওযু করো।

স্বামী ওযু করে জামাকাপড় পরে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলো। বর্ষাকাল। রাস্তার খানাখন্দগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। এখনো আঁধার পুরোপুরি কাটেনি। পিছল খেয়ে একটা গর্তে পড়ে গেলো। পুরো শরীরে কাদা লেপ্টে গেলো। বাসায় ফিরে এলো। শরীর ধুয়ে, কাপড় বদলে আবার রওয়ানা দিলো। আগের জায়গাটা এবার সতর্কতার সাথে পার হতে লাগলো।

অতি সতর্ক হতে গিয়ে আবার ধপাস করে পড়ে গেলো। লোকটা বাড়ি ফিরে এলো। গা-ধুয়ে, কাপড় বদলে আবার রওয়ানা দিলো।

ঘর থেকে বের হয়েই দেখলো বাতি হাতে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে পথ দেখিয়ে চললো। মসজিদের দরজায় পৌঁছলো। এবার বাতিওয়ালা লোকটা ফিরে চলে যাচ্ছে।

–কী ভাই, নামায পড়বেন না?

–না ভাই, আমি নামায পড়বো না।

–মসজিদ পর্যন্ত আসলেন, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। এত ভালো কাজ করেও নামায পড়বেন না?

–না আমি নামায পড়ি না। আমি শয়তান।

–আমাকে পথ দেখিয়ে আনলেন যে বড়?

–পথ দেখিয়ে এনেছি, তার কারণ আছে। আপনাকে পথের কাদায় আছড়ে ফেলেছিলাম আমিই। প্রথমবার ফেলেছিলাম। আপনি ঘরে ফিরে গেলেন। ভেবেছিলাম আপনি আর ফিরে আসবেন না।

আমার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে আপনি ফিরে আসলেন। আবার ফিরে আসার কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনার গুনাহ মা'ফ করে দিলেন।

দ্বিতীয়বার আপনাকে আছড়ে ফেললাম। আপনি পরিষ্কার হয়ে আবার ফিরে এলেন। এবার ফিরে আসার কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবারের সবার গুনাহ মা'ফ করে দিলেন।

তৃতীয়বার আর আপনাকে আর ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না। কারণ এবারও যদি আপনাকে ফেলে দিতাম, আর আপনি ঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসতেন; আল্লাহ তা'আলা আপনার সমস্ত প্রতিবেশীর গুনাহ মা'ফ করে দিতেন।

আমি তো এই ঝুঁকি নিতে পারি না। তাই আপনি যাতে আর পিছল না খান সেজন্য নিজেই বাতি হাতে এগিয়ে এলাম।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৩

নামাযপ্রেমী বধূ

দু'বছর আগে বাবা মারা গেছেন। অতি ধার্মিক বাবা সন্তানদেরকে ধার্মিক হিশেবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কমতি করেননি।

আব্বু সবসময় বলতেন,

–আমার আম্মু আফীফা! একটা কথা মনে রাখবে, দুনিয়া একদিকে গেলেও নামাযের ব্যাপারে কোনও আপোস করবে না। যত কষ্টই হোক দিনে একবার হলেও কুরআন কারীম নিয়ে বসবে।

আব্বু ছোটখাটো একটা চাকরি করতেন। সংসারে অভাব না থাকলেও প্রাচুর্য ছিলো না। ধনী পিতার সন্তান আমার আম্মু এই সংসারে বেশ মানিয়ে নিয়েছিলেন। তারপরও আমরা বুঝতে পারতাম আম্মুর কষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি হাসিমুখে সব মেনে নিতেন।

আম্মু বিয়ের পরও ধর্মকর্মের প্রতি অতোটা মনোযোগী ছিলেন না। আব্বু আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নামায ধরিয়েছিলেন।

ভাইয়া আব্বুর মতো না হলেও বেশ ধার্মিক।

আফীফার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলো। একটা কষ্ট সারাক্ষণ গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। আব্বু নেই। দু'বছর হয়ে গেলো।

বড় মামাই সব দেখাশোনা করেন। তাছাড়া আম্মুও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অনেক টাকা পাওনা আছেন।

মামাই সম্বন্ধ এনেছেন। পাত্রপক্ষ অনেক বড় ঘরের। আম্মু প্রথমে আপত্তি করেছেন। মেয়েটা অত পয়সাওয়ালা ঘরে গিয়ে ধর্ম পালন করতে পারবে কি না সন্দিহান ছিলেন।

ছেলের বাবা একথা জানতে পেরে আকাশ থেকে পড়লেন। না না, কোন সমস্যা হবে না।

আজ বিয়ে। আফীফার শুধু আব্বুর কথা মনে পড়ছে। কানে সারাক্ষণ ভাসছে,

কই গো! আমার আম্মু আফীফা কই।

ঘরের সব গোছগাছ শেষ। বিকেলে বিউটিশিয়ান ঘরে আসবে। সাজিয়ে দিবে।

আফীফা বলে দিয়েছে, আসরের পরপরই যেন চলে আসে। কিন্তু দেরি করে ফেললো। সাজানো শুরু হলো। আফীফা মাগরিবের আগেই কাজ শেষ করতে বলে দিলো।

বিউটিশিয়ান কাজ অর্ধেক শেষ না করতেই মাগরিবের আযান হয়ে গেলো।

–আমি নামায পড়তে যাবো।

–আরেকটু, শেষ হয়ে এসেছে। শেষ হওয়ার আগে পানি লাগলে মেকাপের ক্ষতি হবে।

–মাগরিবের সময় বেশিক্ষণ থাকে না।

ব্যাপারটা জানার পর আম্মু এসে বললেন, নামাযটা পরেও তো পড়া যাবে। একজন বললো মাগরিব আর ইশা তো একসাথে পড়ার বিধান আছে।

আরেকজন বললো নামায পড়তে চাইলে পড়ুক। পানি লাগানোই তো সমস্যা। তায়াম্মুম করে নিলেই হবে।

মামা এসে বলে গেলেন, এখন নামায পড়তে হবে না। কে যেন ভাইয়াকে খবর দিয়ে আনলো। আফীফা ভাইয়ার কথাকে গুরুত্ব দেয় সেজন্য। ভাইয়া এসে বললেন,

–দেখ! আফী, সবাই যখন এত করে বলছে, নামাযটা না হয় পরেই পড়লি?

–না ভাইয়া, এটা সম্ভব নয়। আমাকে নামায পড়তেই হবে। আব্বু বোধহয় আজকের দিনকে উদ্দেশ্য করেই আমাকে বলতেন,

–আমার আম্মু, আফীফা! দুনিয়া একদিকে গেলেও নামাযের ব্যাপারে কোনও আপোস করবে না।

–আফী, মামা খুব রেগে গেছেন।

–ভাইয়া! আমাকে ক্ষমা করো। আমার নামায পড়ার কারণে যদি বিয়েটা ভেঙেও যায়, তবুও আমি নামায পড়বো। কাযা হতে দেবো না।

আমি নামায পড়বো, আর আল্লাহ আমার কোনও ক্ষতি করবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি না।

আফীফা সবার বিরক্তি উপেক্ষা করে পানি দিয়ে ওযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৪

কারামুক্তি

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই। তিনি একটু খেয়ালি। সবার সাথেই হেঁয়ালি করেন। গতমাসে রাজ্যের এক ঘোরতর বিদ্রোহী বন্দি হয়েছে। পাশের রাজ্যের সেনাপতির সাথে যোগসাজশ করে রাজাকে উৎখাতের পাঁয়তারা কষছিলো।

আগামীকাল তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আসামীকে আলাদা কুঠুরিতে রাখা হয়েছে। ভালোমন্দ খেতে দেয়া হচ্ছে।

বিকেলে রাজার বাই চাপলো, আসামীর সাথে একটা খেলা করা যাক। ঘরের পোশাকেই একজন নফরকে সাথে নিয়ে তিনি জেলখানায় চলে এলেন। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখলেন আসামী বিষণ্নচিত্তে বসে আছে।

দরজা খুলে ভেতরে গেলেন। আসামী রাজাকে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি উঠে কুর্নিশ করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজা একথা সেকথার পর বললেন,

–মরিস! তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে চাই। তোমার এই সেলের কোথাও একটা বহির্গমন পথ আছে। তোমাকে সারা রাত সময় দেয়া হলো। এক রাতের মধ্যে সেটা বের করতে পারলে তুমি মুক্ত। তোমাকে কেউ আটকাবে না। সূর্য উঠার সাথে সাথে তোমার এই সুযোগ রহিত হয়ে যাবে।

মরিসের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি সব খুলে দেয়া হলো। রাজা বের হয়ে এলেন। গরাদের ফাঁক দিয়ে বললেন, দেখো পুরো একটা রাত হাতে পাচ্ছো। সম্ভাব্য সবদিকে চেষ্টা করে দেখতে ভুলবে না। রাজার সাথে সাথে জেলখানার প্রহরীরাও চলে গেলো।

রাজা চলে যাওয়ার পরপরই মরিস কাজে নেমে পড়লো। প্রথম দফায় কোন রাস্তা বের হলো না। দ্বিতীয়বারে একজায়গায় সন্দেহ হওয়াতে অনেক ধাক্কাধাক্কির পর দেয়ালটা ক্যাঁচকোঁচ করে একদিকে সরে গেলো। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে সামনের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর আলোর আভাস ফুটে উঠলো। দ্রুত সেদিকে গিয়ে দেখলো সে ঘুরেফিরে তার সেলেই ফিরে এসেছে। সে বুঝতে পারলো, একটা গোলকধাঁধাতেই এতক্ষণ সে ঘুরপাক খেয়েছে।

একটু জিরিয়ে আবার চেষ্টা শুরু করলো। এবার আরেক দিকে একটা সুড়ঙ্গ বের হলো। অন্ধকারে ঠোকর খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধরে সামনে এগিয়ে গেলো, পথ ফুরোচ্ছে না। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সে পথ চলছে। এক সময় সে, দূর থেকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলো। দৌড়ে সেদিকে এগিয়ে গেলো। আবারো সে নিজেকে তার আগের সেলে দেখতে পেল।

এবার মরিস ভেঙ্গে পড়লো। রাজা বোধহয় তাকে ধোঁকা দিয়েছেন। সকাল হয়ে গেলো। রাজা আবার আসলেন। বললেন, তুমি বের হতে পারলে না কেন?

–ইওর হাইনেস! আমি সারারাত খুঁজেও বের হওয়ার কোনও দরজা খুঁজে পাইনি। পেয়েছি কতগুলো গোলকধাঁধা। আমি এই প্রকোষ্ঠের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজেছি।

–আমি কিন্তু তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি। তোমাকে বলেও গিয়েছি, সম্ভাব্য সব জায়গায় চেষ্টা করে দেখতে।

–আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি তো করিনি।

–না, ত্রুটি তো অবশ্যই করেছো। না হলে তুমি এখনো 'যবনিকার অন্তরালে' কেন? গতরাতে যাওয়ার সময় আমি তোমার সেলের দরজাটা খোলাই রেখে গিয়েছি। দরজায় কোন তালা ছিলো। তুমি আসল জায়গাই খুঁজে দেখানি।

মানুষ সবসময় ভাবে, সফলতার জন্য বোধহয় কঠিন পথ মাড়াতে হবে। অথচ অনেক সময় একদম সহজ পথেও সফলতা এসে ধরা দেয়। কিন্তু মানুষ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। সহজলভ্য সাফল্য অধরাই থেকে যায়।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৫

হীরা-জহরত

একজন বুযুর্গ ব্যক্তি তার শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে একটা গল্প বললেন,

একদল লোক ভ্রমণে বের হলো। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দলনেতা বললো, সামনে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। সেটা পার হলে একটা বসতি পড়বে।

সেই বসতিতে আমরা দুপুরের খাবার সারবো। সবাই পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলো।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ শুরু হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর, তারা অনুভব করলো সূচালো কিছু পায়ের তলায় খোঁচা দিচ্ছে। দুয়েকজন আহতও হলো।

অন্ধকারে সূচালো বস্তুগুলো উঠিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে কেউ কেউ ভাবলো, যদি আরেক জনের গায়ে লাগে, তাই সেগুলো ফেলে না দিয়ে, কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। রাস্তাটা পরিষ্কার থাকলে পরে যারা আসছে তারা কষ্ট পাবে না।

কেউ কেউ পাথরগুলোকে তুলে না নিয়ে সঙ্গীকে দিয়ে দিলো। আর কেউ সেগুলোকে মাড়িয়েই টানেল পার হলো।

যারা সূচালো বস্তুগুলোকে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলো, তারা টানেল থেকে বের হয়ে আসার পর পকেটে হাত দিলো। অহেতুক ভারী পকেট নিয়ে হাঁটার প্রয়োজন কী? এবার ফেলে দিই। তারা পকেট থেকে বের করে দেখে, সূচালো বস্তুগুলো আর কিছু নয়; নিখাঁদ হীরা।

অন্য সবাই আফসোস করতে লাগলো। যারা নিয়েছে তারা আফসোস করে বলতে লাগলো, ইশ! আরো কেন নিলাম না।

আর যারা নেয়নি তারা আফসোস করতে লাগলো, ইশ! আমরাও কেন যে ওদের মতো তুলে নিলাম না।

এই দুনিয়াও ঠিক এই টানেলের মতো। এখানকার কাজকর্মগুলো হীরের মতো। আখিরাতে যাদের আমল কম হবে তারা আফসোস করবে, হায়! আমরা আরো কেন যে আমল করলাম না।

বিষমাখা রুটি

বিয়ের আগে দাদু বলতেন,

-রিফদা! কাজ যাই করিস, আল্লাহর জন্যই করবি। আর যাই খাবি, যতটা পারিস একজন গরিবকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করিস।

দাদু তো এখন জান্নাতে। কত বছর আগের কথা! কিন্তু স্বামীর সংসারে এসেও কথাটা সবসময় মনে পড়ে।

শাশুড়ী ভাত খেতে পারেন না। বেশির ভাগ সময় রুটি খেয়ে থাকেন। সেজন্য দিনে কখনো তিন বেলাই রুটি বানাতে হয়। উনি আবার বাসি রুটি খেতে পারেন না। রিফদা প্রতিদিন রুটি বানাতে বসলে একটা রুটি বেশি বানায়। সবাইকে লুকিয়ে রুটিটা জানালায় রেখে দেয়। একজন বৃদ্ধ লোক লাঠি ঠকঠক করে এসে চুপিচুপি রুটিটা নিয়ে যায়।

শুরুটা হয়েছিলো আরো একমাস আগে। একদিন বৃদ্ধটা জানালার পাশে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো। রিফদা লোকটাকে দেখে ব্যথিত হলো। একটা রুটি বাড়িয়ে দিলো। লোকটা প্রায় ছোঁ মেরে রুটিটা নিলো। গাপুস গুপুস করে খেয়ে ফেললো। পরদিনও বৃদ্ধ এসে হাজির। রিফদা আবারও তাকে একটা রুটি দিলো। এভাবে প্রতিদিন।

একটা বিষয় দেখে রিফদা অবাক হতো। প্রতিদিন রুটি নিয়ে যেত, কিন্তু কোনও কৃতজ্ঞতা জানাতো না। প্রশংসা তো দূরের কথা। রিফদা একদিন লক্ষ্য করে দেখলো লোকটা রুটি খেয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে।

পরদিন কান পেতে শুনলো, লোকটা বলছে,

-'খারাপ কাজ নিজের কাছেই থেকে যায়। ভালো কাজ উপহার হয়ে ফিরে আসে'।

এভাবেই চলছিলো। কিন্তু লোকটার প্রতিদিন একই কথা শুনে রিফদা বিরক্ত হয়ে উঠলো। এমন অকৃতজ্ঞ লোকটাকে একটা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করলো।

গতকালের একটা বাসি রুটির সাথে ওষুধ মাখিয়ে ইঁদুর মারার যন্ত্রে রেখেছিলো। ওটা এখনো আস্ত রয়ে গেছে। ইঁদুর ছুঁয়েও দেখেনি। আজ ওটাই জানালার পাশে রেখে দিলো। এই রুটি খেয়ে লোকটা মরবে না বটে, কিন্তু পেটে সমস্যা হবে। একটা শিক্ষা তো হবে।

কিছুক্ষণ পর রিফদার মনে অনুশোচনা জাগলো। তার ভাবনায় এলো, সে এটা কী করছে? সে কি প্রতিদান আর প্রশংসার জন্য এ কাজ করছে? সে তাড়াতাড়ি রুটিটা সরিয়ে, একটা ভালো রুটি রেখে দিলো। যথসময়ে লোকটা এলো। রুটি নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বললো,

–'খারাপ কাজ নিজের কাছে থেকে যায়। ভালো কাজ উপহার হয়ে ফিরে আসে'।

রিফদার স্বামী অন্য শহরে চাকরি করে। সেদিন বিকেল বেলা রিফদা ঘরের টুকিটাকি কাজ সারছিলো। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে দেখলো স্বামী দাঁড়িয়ে আছে। দুচোখ ঘোলাটে। পরনের জামা-কাপড় ধূলি-মলিন আর শতচ্ছিন্ন।

তাড়াতাড়ি সে স্বামীকে ঘরে নিয়ে বসালো। পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললো,

–আপনার এই অবস্থা কেন?

–বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। আসার দিন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লো। অধিকাংশ যাত্রীই মারাত্মকভাবে আহত। আলহামদুলিল্লাহ আমি অক্ষতই ছিলাম। সাথে টাকাপয়সা যা ছিলো সব গাড়ির সাথেই নদীতে ডুবে গেছে। হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসছিলাম, কয়েকদিনের অভুক্ত ছিলাম। পা আর চলছিলো না। আমার টলোমলো পা দেখে একজন বৃদ্ধ লোক আমার হাত ধরলো। তার কাছে একটা রুটি ছিলো। সেটা খেতে দিলো।

রুটিটা খেয়েই এতদূর হেঁটে আসার শক্তি পেলাম।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৭

আমার আমি

রাফাদ ঘর থেকে বের হলো। ছয় মাস হলো একটা চাকরিতে যোগ দিয়েছে। ওরা একই ব্যাচের তিনজন এক কেমিক্যাল কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে। আজ বিশেষ একটা মিটিং আছে। একটা এসাইনমেন্ট পেপার জমা দিতে হবে।

সে পছন্দ করে কেনা পোশাক পরে ঘর থেকে বের হলো। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা।

–কিরে রাফাদ কোথায় যাচ্ছিস?

–কেন অফিসে!

–আজ কি অফিসে বিশেষ কিছু আছে?

–আছে। অফিসে বিশেষ একটা মিটিং আছে। আমাকে একটা পরিকল্পনা পেশ করতে হবে। ব্যাখ্যা করে বসদের বোঝাতে হবে। বোঝাতে পারলে প্রকল্পটা গৃহীত হবে।

–কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই পোশাক পরে যাচ্ছিস?

–কেন কী হয়েছে?

–তোর প্যান্টের সাথে এই শার্টের রঙ তো একদম খাপ খায়নি।

রাফাদ ঘরে এসে পোশাক বদলে বের হলো। তার মন কিছুটা খারাপ। গত শুক্রবারে নিউ মার্কেট গিয়ে অনেক ঘুরে এই সেটটা কিনেছিলো। গেইট দিয়ে বের হওয়ার সময় চাচাত ভাই রাবিতের সাথে দেখা।

–ভাইয়া! অফিসে যাচ্ছো বোধ হয়।

–জি। তুই কিছু বলতে এসেছিস?

–নাহ, এমনিই এলাম। ভাইয়া তোমার চুলগুলো এমন করে আঁচড়েছো কেন? একদম সুন্দর দেখাচ্ছে না।

রাফাদ আবার ঘরে এসে চুলগুলো ভিন্নভাবে আঁচড়ে অফিসে রওনা দিলো। অফিসে গিয়ে দেখলো দুই বন্ধু আরিদ আর রুয়াদ ক্যান্টিনে বসে আছে। সেও গিয়ে যোগ দিলো।

–তোরা আমার আজকের বক্তব্যটা একটু শুনে দেখতো। গত একমাস ধরে ক্লোজডোর রিহার্সাল দিয়ে আসছি। ছোট বোন বাসমা বলেছে আমার বক্তব্য আর উপস্থাপনা খুবই ভালো হয়েছে।

–ঠিক আছে, তুই তোর মতো করে বলে যা। আমরা শুনছি।

বক্তব্য শেষ হলে আরিদ বললো। তুই বক্তব্যটা ভালোই মুখস্থ করেছিস, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তোর আওয়াজটা আরেকটু নিচু করতে হবে। হাতটা এভাবে না নেড়ে এভাবে নাড়তে হবে। আর তোর চোখটাকে আরেকটু প্রাণবন্ত করতে হবে।

রাফাদ বসদের সামনে তার বক্তব্য পেশ করলো। বন্ধুদের বলে দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী সব করলো। রাতে সব কাজ শেষ করে বাড়ি আসার সময় আজকের পুরো অনুষ্ঠানের একটা তথ্যচিত্র নিয়ে এলো। পরদিন সকালে বসে বসে তার বক্তব্যের তথ্যচিত্রটা দেখছিলো। এমন সময় ছোট বোন বাসমা এলো। সেও একটা চেয়ার টেনে পাশে বসলো।

–ভাইয়া! তথ্যচিত্রে বক্তৃতা দিচ্ছে যে লোকটা সে কে? অফিসের কেউ?

–তুই কি চিনতে পারছিস না?

এরপর আর রাফাদ কিছু বললো না। তার মনে ভাবান্তর ঘটলো। যেখানে তার ছোট বোনই তাকে চিনতে পারলো না। অন্যরা তাকে কতটা চিনতে পারবে?

গতকাল পুরো দিনের প্রতিটা ক্ষেত্রে তার নিজের বলে তো কিছুই ছিলো না। যে যা বলেছে সেটা মেনে নিয়েছে। গতকালের সে ছিলো অন্য অনেক মানুষের মতামতের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একটা জগাখিচুড়িমার্কা চরিত্র।

যে যা বলে তাই মেনে নিতে গেলে নিজের স্বকীয়তা বলে কিছুই থাকে না। মানুষ অনেকগুলো ছোটখাটো বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটা সত্তা। আশেপাশের সবাইকে খুশি রাখতে গেলে নিজের বলে আর কিছুই থাকে না। অন্য মানুষে পরিণত হতে হয়।

আমার পোশাকের রঙ অন্যের ভালো লাগার চেয়েও জরুরি হলো, আমার ভালো লাগছে কি না। আমার চুলের ভঙ্গি অন্যের পছন্দ হওয়ার চেয়েও জরুরি হলো, আমার পছন্দ হলো কিনা সেটা। আমার গলার আওয়াজ অন্যের পছন্দ হলো কিনা তার চেয়েও জরুরি হলো আমার কাছে পছন্দ হলো কি না সেটা।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৮

ষাঁড়ের লেজ

রজব আলী একজন কৃষক। অনেক জমি-জিরেত। নিজেই জমির চাষাবাদ দেখাশোনা করেন। তার কিছুরই অভাব নেই। সারাদিন চোখ-কান বন্ধ করে পরিশ্রম করেন।

তিনি কৃষক হলেও ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। বড় মেয়ে আমিলা বিয়ের উপযুক্ত। সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে। রজব আলীর একটা অদ্ভুত বাসনা ছিলো। মেয়ের বিয়ের জন্য প্রথম সম্বন্ধ যেটা আসবে সেটাকেই গ্রহণ করে ফেলবেন। ফিরিয়ে দেবেন না। বেশি বাছবিচার করবেন না।

গত জুমাবারে নামায পড়ে আসার সময়, সোবহান মেম্বার যেচে এসে আলাপ করলেন। বেশি কিছু বলেননি। কুশল বিনিময় করেই বিদায় নিয়েছেন। রজব আলী কিছুটা ঠাহর করতে পেরেছেন। বিকেলে বিষয়টা একদম পরিষ্কার হয়ে গেলো। ইমাম সাহেবই কথাটা পাড়লেন। মেম্বার সাহেব নিজে না বলে ইমাম সাহেবকে দিয়ে ছেলের বিয়ের প্রস্তাবটা পেশ করেছেন। রজব আলী কিছুকক্ষণ চুপ থেকে ইমাম সাহেবকে বললেন,

–ঠিক আছে হুজুর! আমি ভেবে দেখি। ঘরে অন্যদের সাথেও কথা বলতে হবে। আপনাকে আমি পরে জানাবো।

রাতে খাওয়ার পর রজব আলির উঠোনে চেয়ারে বসে বসে পান খাওয়ার অভ্যেসটা অনেক দিনের পুরোনো। আজ পান খেতে খেতে স্ত্রী আমেনাকে প্রস্তাবটার কথা বললেন।

–ওমা! তাই নাকি? মেম্বার সাহেবের ছেলে তো একখান চাঁদের টুকরো। ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করে। অনেক বড় শিক্ষিত।

–রাখো, চাঁদের টুকরা হলেই তো চলবে না। কাজের মানুষ হতে হবে। কর্মঠ হতে হবে। বড়লোকের ছেলে, টাকা-পয়সার উপর মানুষ হয়েছে। উপরে ভালোমানুষি দেখালেও ভেতরে কেমন ঠিক বোঝা যায় না। বিয়ের পর মেয়েটা যদি কষ্ট পায়।

–ঠিক আছে আপনি যা ভালো বুঝেন; করেন।

রজব আলী পরদিন ইমাম সাহেবকে বললেন,

–আমি ছেলের সাথে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।

–ছেলে আগামীকাল আসবে।

পরদিন মেম্বার সাহেবের ছেলে রাফিদ নিজেই হাঁটতে হাঁটতে এ পাড়ায় এলো। বিনয়ের সাথে সালাম দিলো।

–রজব চাচা! কেমন আছেন?

–ভালো আছি বাবা! চলো সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে যাই। তোমার আব্বা আমার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, সেটা তো জানো?

–জি, চাচা।

–তোমারও কি তাই ইচ্ছে? লজ্জা না পেয়ে সরাসরি বলো।

–জি, চাচা।

–আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কাছে আমার একটা আব্দার আছে।

–কী চাচা?

–তোমাকে একটা ছোট্ট পরীক্ষা দিতে হবে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটা তোমাকে করতে হবে। পরীক্ষাটা হলো,

–আমাদের তিনটা ষাঁড় আছে। আমি ষাঁড়গুলোকে গোয়াল ঘর থেকে ছেড়ে দেবো। সেগুলো পুকুর পাড় দিয়ে জমিতে নামবে। তোমার কাজ হলো সেগুলোর কোনও একটার লেজ ধরে থামানো।

রিফাদ অবাক হলো। এ আবার কেমনতরো পরীক্ষা? কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বললো না। এ ঘরে সম্বন্ধ করার কথা সেই মাকে দিয়ে আব্বার কানে তুলেছে। এখন তার কোনও আচরণে সম্বন্ধটা ভেঙে যাক, তা হতে দেওয়া যায় না।

রিফাদ গিয়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়ালো। প্রথম ষাঁড় গোয়াল থেকে বের হলো। ষাঁড়টা দেখে রিফাদের দুচোখ কপালে উঠলো।

–এতবড় ষাঁড়ও হয়, গোয়ালঘরের দরজা খোলা হতেই ষাঁড়টা তেড়েফুঁড়ে পুকুরপাড়ের দিকে এলো।

রিফাদ ভাবলো, এই ভয়ংকর ষাঁড়ের লেজ ধরার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। এটা চলে যাক। পরেরটার লেজ যেভাবেই হোক ধরে ফেলবে।

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় ষাঁড়টা বের হলো। ওটার মাথা দেখেই রিফাদ দ্বিতীয় কোনও কথা না ভেবেই দৌড়ে পুকুর পাড় ছেড়ে অন্য দিকে পালিয়ে বাঁচলো। এতবড় ষাঁড় সে জীবনেও দেখেনি। ওটা গোয়াল ঘর থেকে বের হয়েই রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে মাটিতে পা ঠুকছিলো। ওকে সামনে পেলে নির্ঘাত পিষে ফেলতো।

-থাক ওটাও চলে যাক। তৃতীয়টা যেমনই হোক ওটার লেজ আর ছাড়া যাবে না। এবার জীবন-মরণ সমস্যা। এসপার-ওসপার একটা বিহিত করতেই হবে।

তৃতীয়টা বের হলো। ওটা দেখে রিফাদের হাসি আর থামে না। ষাঁড়টা গোয়াল থেকেই বের হতে চাচ্ছে না। একেবারে শীর্ণকায়। দুবলা-পাতলা। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর কিছুদূর এসেই ঝিমুতে লাগলো। ঢুলুঢুলু চোখে জাবর কাটতে লাগলো।

রিফাদ এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে লেজ ধরতে গিয়ে দেখলো ওটার লেজই নেই।

রজব আলী এগিয়ে এলেন। বললেন:

–বাবা! পুরো জীবনটাই নানা সুযোগে ভর্তি। কিছু সুযোগ সহজে লাভ করা যায়। কিছু সুযোগ লাভ করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কঠিন সুযোগগুলো যদি এই আশায় ছেড়ে দেই যে, পরে আরো সহজ সুযোগ পাই কি না দেখি। তাহলে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

পরে আর সুযোগ আসে না। যে সুযোগ চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। সবসময় প্রথম সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে ফেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ। পরে আর সুযোগ নাও আসতে পারে।

জীবন জাগার গল্প : ১৭৯

নারী নয়, রানী

বাসসাম ক্যামব্রিজে পড়াশুনা করে। বাড়ি মিশর। দুই পুরুষ ধরেই লন্ডনে বাস করছে। দাদা ইখওয়ানের প্রথম দিককার কর্মী। জামাল নাসেরের প্রথম দফার গণ-গ্রেফতারে তার দাদাও ছিলেন। দাদা ছিলেন ক্যামব্রিজ ফেরত। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এদেশে পাড়ি জমান।

আজ বাসসাম কলেজ থেকে ফিরছিলো। বাসে উঠে জানালার পাশের একটা আসনে বসলো। একটু পরে একজন ইংরেজ বুড়ো তার পাশে বসলো। এই বুড়োগুলো বড় বেয়াড়া ধরনের হয়। নাক উঁচু ভাব দেখায়। ওরা মনে করে এখনো ইংল্যান্ড ঔপনিবেশিক যুগে আছে।

ওরা সারা বিশ্বের রাজা। ওরা সেরা জাতি। এই হামবড়া ভাব অবশ্য তরুণদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এই বুড়োগুলোই ...।

বৃদ্ধলোকটা যেচেই কথা বললেন। অনেক কিছু জানতে চাইলেন। শেষে এক বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন:

–আপনাদের ধর্মে, মেয়েরা সবাইকে সালাম দিতে পারে না। আবার সব পুরুষও সব নারীকে সালাম দিতে পারে না। একজন নারী সবার সাথে হাত মেলাতে পারে না। কেন?

–এটা সত্য কথা। এতে তো কোনও সমস্যা দেখি না। আচ্ছা, আপনাদের রানীর সাথে কি সবাই হাত মেলাতে পারে? যে কেউ চাইলেই কি রানীর সাথে কথা বলতে পারে?

–না পারে না। মাত্র সাত শ্রেণির মানুষ রানীর সাথে হাত মেলাতে পারে। এটা রাজকীয় আইনেই নির্দিষ্ট করা আছে।

–আমাদের ধর্মীয় আইনেও প্রতিটি নারী একজন রানীর মর্যাদা পায়। সবাই তাদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা রাখে না। তার সাথে হাত মেলানোর যোগ্যতা রাখে না। যেমনটা আপনাদের রানীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইসলাম চৌদ্দজন পুরুষকে নারীর সামনে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কথা বলার অনুমতি দিয়েছে। সরাসরি সালাম দেয়ার অনুমতি দিয়েছে:

পিতা, সৎ পিতা, দাদা, নানা, শ্বশুর, ছেলে, দুধছেলে, ভাই, দুধভাই, চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনা, নাতি।

জীবন জাগার গল্প : ১৮০

রাজার শিকার

বাদশাহ ভ্রমণে বের হবেন। সাথে মৃগয়াটাও (শিকার) সেরে ফেলবেন, এমনটাই ইচ্ছা। সাথে গেলো চাকর-নফর। উজির-নাযির-সেপাই-সান্ত্রী সবাই সাথে আছে।

রাজা যেকোন কাজেই প্রধান উযিরের সাথে পরামর্শ করেন। উজির কথায় কথায় একটা কথা বারবার বলেন:

আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। কোনও বড় ধরনের বিপদ এলো। বাদশাহ তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। উজির এক কথায় বলে দিলেন,

আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।

এবার শিকারে গিয়েও একই ঘটনা। একটা শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে রাজা দলবল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, বনের গভীরে চলে গেলেন। ঘোড়াটাও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বাদশাহ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ বাদশাহর পায়ে কী যেন একটা লেগে জ্বালাপোড়া করে উঠলো। জ্বালাটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো।

বাদশাহ ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলেন। ঘোড়া আপন মনে, দুলকি চালে চলতে লাগলো। বাদশাহ পরদিন নিজেকে বিছানায় পেলেন। চোখ মেলেই দেখলেন, প্রধান উজির উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। উজির তাকে জানালো,

–জাহাঁপনা! আপনি বেহুঁশ ছিলেন। ঘোড়া আপনাকে গভীর রাতে তাঁবুতে নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাকলাম। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললো,

–আঙুলে অত্যন্ত বিষাক্ত কোনও কিছু লেগেছে। আঙুলটা কেটে ফেলতে হবে। না হলে পুরো শরীরেই পচন ছড়িয়ে পড়বে। আমরা রানীর সাথে যোগাযোগ করেছি। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। বাদশাহ বললেন, তুমি কি এখনো বলবে, 'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন'?

–জ্বি জাহাঁপনা।

বাদশাহ ভীষণ রেগে গেলেন। উজিরকে গ্রেফতারের আদেশ দিলেন। কয়েক দিন বিশ্রাম করার পর বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাজা এবার একা একা শিকারে বের হলেন। একটা হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে বনের শেষপ্রান্তে চলে এলেন। হরিণটা হঠাৎ করে, কোথাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো। বাদশাহ ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে লাগলেন। আচমকা একদল জংলী এসে রাজাকে বন্দী করে ফেললো। তাকে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে, তাদের ডেরায় নিয়ে এলো।

তাকে পেয়ে জংলী বসতির সবাই আনন্দে ফেটে পড়লো। বাদশাহ ভাষা বুঝতে না পারলেও, তাদের কর্মকাণ্ড দেখে বেশ বুঝতে পারছিলেন যে তাকে বলি দেয়া হবে। সেজন্য মন্দিরের বেদীমূল পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঝাড়- পোঁছ হচ্ছে। কয়েকজন এসে বাদশাহকে ধরাধরি করে একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে একজন ওঝা বসে আছে। বাদশাহকে নিয়ে একটা লতাপাতার খাটিয়ায় শোয়ানো হলো। ওঝা এসে বাদশাহর মাথা থেকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো। পুরো শরীর পরীক্ষা করে ওঝার মুখে আর হাসি ধরে না। বাদশাহ তো ভয়ে আধমরা হয়ে আছেন।

হঠাৎ ওঝার মুখের হাসি থেমে গেলো। ওঝা পায়ের কাটা আঙুলটা দেখে মুখ কালো করে ফেললো। বাদশাহ দেখলেন, তারা কয়েকজন এসে তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে ছেড়ে দিলো।

বাদশাহ বুঝতে পারলেন, এই জংলীরা নিখুঁত শরীরের কাউকে বলি দেয়ার জন্য খুঁজছিলো। তার পায়ের আঙুল কাটা থাকায় বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে উজিরকে মুক্ত করে আনার আদেশ দিলেন।

উজির দরবারে আসলে বাদশাহ বললেন,

'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন'

জীবন জাগার গল্প : ১৮১

কল্যাণকামিতা

গ্রামের একজন লোক কোত্থেকে যেন একটা ঘোড়া নিয়ে এলো। গ্রামে সবার মাঝে সাড়া পড়ে গেলো। সবাই দেখতে এলো।

ঘোড়াটার উপর এক চোরের চোখ পড়লো। অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়াটা চুরির কোন উপায় বের করতে পারলো না।

চোর তক্কে তক্কে রইলো। অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পর সে জানতে পারলো, ঘোড়ার মালিক প্রতিদিন বিকেলে নদীর তীরে বেড়াতে যায়।

পরদিন চোর আগে আগে গিয়ে নদীর তীরে রাস্তার একপাশে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ঘোড়সওয়ার সে পথে এলো। দেখলো একজন লোক ব্যথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

—কী ভাই, তোমার কী হয়েছে?

—ভাই রে! আমি মরে যাচ্ছি। হাঁটতে পারছি না। আমাকে কি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন?

—অবশ্যই পারবো।

ঘোড়সওয়ার নেমে গেলো। অসুস্থ ব্যক্তিকে ধরাধরি করে ঘোড়ায় তুলে দিলো। অসুস্থ ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়েই টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

ঘোড়ার মালিক হায় হায় করে উঠলো। বুঝতে পারলো, লোকটা তাকে ধোঁকা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে পালাচ্ছে। সে জোরে হাঁক দিয়ে বললো, ও ভাই! একটা কথা শুনে যাও।

—কী কথা?

—আমার একটা কথা রাখতে পারবে?

—কী কথা?

—তুমি যে অসুস্থতার ভান করে ঘোড়াটা বাগিয়েছো, এটা কাউকে বলতে পারবে না।

—এতে কী লাভ?

–লাভ হবে, মানুষ যদি এই ঘটনা জেনে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে প্রকৃত কোনও অসুস্থ ব্যক্তিও যদি এভাবে পড়ে থাকে, তাহলে তারা ভাববে লোকটাও তোমার মতো ভান করে পড়ে আছে। তাহলে দেশ থেকে পরোপকার বিষয়টাই উঠে যাবে।

জীবন জাগার গল্প : ১৮২

আত্মত্যাগ

ঝগড়া লেগে গেলো পেন্সিল আর রবারের মধ্যে। সে কি তুমুল লড়াই। শুরুটা হয়েছিলো ভালোয় ভালোয়। পরে ঝগড়াটা তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েছে। কথাটা শুরু করেছে রবার।

–কেমন আছো, বন্ধু?

–এ্যাই, আমাকে বন্ধু বলবে না। আমি তোমার বন্ধু নই।

–কেন?

–আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

–কেন ঘৃণা করো?

–কারণ, আমার রক্ত খরচ করে যা লিখি, তুমি তা মুছে ফেলো।

–আমি তো শুধু ভুলগুলোই মুছি।

–তুমি মোছার কে?

–আমি একজন মোছনি। এটাই আমার কাজ।

–আরে ছেহ্, এটা কোনও কাজই নয়।

–আমার কাজটা তোমার কাজের মতোই অত্যন্ত দরকারী 'মার উপকারী।

–তুমি তো বোকার স্বর্গে আছো, আমি তোমার চেয়ে উত্তম। আর তুমি অহংকারীও বটে।

পেন্সিল বললো,

–কিভাবে?

–যে মোছে তার চেয়ে যে লিখে সেই তো উত্তম।

–ভুল দূর করা, সঠিক কিছু লেখার মতোই সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ আমি ভুলগুলো মুছে ফেলার পর লেখাটা নির্ভুল হয়। ফলে আগের চেয়ে লেখাটার মূল্যও বেড়ে যায়।

আমার ছোঁয়া পাওয়ার পরই একটা লেখা মানুষের সামনে আসার উপযুক্ত হয়।

পেন্সিল একথা শুনে মাথা নিচু করে ফেললো। মাথা তুলে বললো,

–তুমি সত্য বলেছো।

–তুমি কি এখনো আমাকে ঘৃণা করো?

–না না, যে আমার ভুল শুধরে দেয়, তাকে আমি কিভাবে ঘৃণা করতে পারি?

–আমি কিন্তু কখনোই কোনও সঠিক লেখাকে মুছি না।

–কিন্তু তুমি দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছো যে?

–তোমার ভুলগুলো সংশোধনের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করি। নিজের শরীরকে ক্ষয় করে ফেলি।

–এখন আমার মনে হচ্ছে, তোমার আত্মত্যাগের সামনে আমি কিছুই না।

–নিজেকে বিলিয়ে দেয়া ছাড়া অন্যের উপকার করা সম্ভব নয়।

–তুমি কতই না মহান! কত সুন্দর তোমার কথা। তুমি আমাকে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শিখিয়েছো। মোমের মতো অন্যের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে শিখিয়েছো।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৩

কৃতজ্ঞতা

রাজা খেপে গেলেন। ঘোষণা দিলেন,

–যারাই কাজেকর্মে ভুল করবে তাদেরকে ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে ছেড়ে দেয়া হবে।

রাজা দশটা কুকুরকে ক্ষুধার্ত রাখতে হুকুম দিলেন। কী এক ব্যাপারে একজন উযিরের একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গেলো। রাজা সেই উজিরকে কুকুরের মুখে ফেলে দেয়ার হুকুম দিলেন। উজির কাকুতি মিনতি করে আবেদন করলেন,

–গত দশ বছর ধরে আপনার সেবা করে আসছি। এখন মরার আগে, জাহাঁপনার কাছে শুধু একটা আবদার।

-কী আবদার?

-আমি দশটা দিনের জন্য দণ্ডটা মওকুফ চাই।

-ঠিক আছে। দশদিন পর ঠিকঠিক এই সময়ে দরবারে হাজির হবে।

উজির কুকুরের প্রশিক্ষকের কাছে গিয়ে বললো:

-আমি এই দশটা দিন কুকুরগুলোর সেবাযত্ন করতে চাই।

প্রশিক্ষক অবাক হয়ে জানতে চাইলো,

-কিন্তু জীবনের শেষ দশটা দিন ইবাদত-বন্দেগিতে না কাটিয়ে, কুকুরের সেবায় অন্তিম দিনগুলো কাটানোতে কী ফায়েদা?

-পরে বলবো।

-ঠিক আছে, আপনি কুকুরের সেবা করতে পারেন।

উজির কুকুরগুলোর সেবাযত্নে লেগে গেলো। তাদের নিজে হাতে খাওয়ালো। তাদের শরীর দলাই-মলাই করে দিলো। সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দিলো। যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দিলো। সারাক্ষণ কুকুরের পেছনে লেগে রইলো।

দশদিন পর। উজির আত্মসমর্পণ করলো। সৈন্যরা উজিরকে ধরে নিয়ে কুকুরের খাঁচায় ফেলে দিলো। রাজা এবং তার অনুচরবর্গ অবাক হয়ে দেখলো:

- কুকুরগুলো উজিরের কাছে এসে তার পায়ের পাতা চাটতে লাগলো। রাজা ভীষণ অবাক হলেন। উজিরকে বললেন,

-তুমি কুকুরগুলোর সাথে কী করেছো?

-আমি গত দশদিন এই কুকুরগুলোর সেবা করেছি। সেগুলো মাত্র দশদিনের সেবাতেই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৪

মোমকাহিনী

কামরাটা নীরব হয়ে আছে। কামরার মধ্যখানে চারটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতিগুলো নিজেদের মাঝে কথা বলছে।

প্রথম মোম: আমার নাম শান্তি। পরিস্থিতি যেমনই হোক, আমাকে কেউ বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। নানা ঝামেলায় আমাকে নিভে যেতে হয়। এই বলে আস্তে আস্তে তার আলোটুকু নিভে গেলো।

দ্বিতীয় মোম: আমার নাম বিশ্বাস। আমি লম্বা সময় টিকে থাকতে পারি না। নানা অবিশ্বাস আর চক্রান্তে আমার অস্তিত্বও হুমকির মুখে থাকে। এ কথা শেষ হতে না হতেই বাতাসের একটা ঝাপটা এলো। মোমটা নিভে গেলো।

তৃতীয় মোম: আমার নাম ভালোবাসা। আমিও সমাজে হিংসা-বিদ্বেষের ছড়াছড়ির কারণে টিকে থাকতে পারি না। কেউ আমাকে অতটা গুরুত্ব দেয় না। মানুষ আমার মূল্য বোঝে না। তারা নিকটজনদের ভালোবাসাকেও ভুলে যায়। একটু পরেই মোমটা নিভে গেলো।

একটা শিশু কামরাটিতে প্রবেশ করলো। তিন মোমের অবস্থা দেখে সে বললো,

–মোমগুলো নিভে গেলো কেন? শেষ পর্যন্ত জ্বললো না কেন? কামরায় আবছা অন্ধকার ছেয়ে আছে। তার একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। তখন চতুর্থ মোম কথা বলে উঠলো।

–বাছা! ভয় পেয়ো না। আমার নাম আশা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আছি ততক্ষণ তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি আমার আগুন দিয়ে অন্য মোম তিনটাকে নতুন করে জ্বালিয়ে দাও। শিশুটি তাই করলো। আশার মোমটাকে হাতে নিলো। নিভে যাওয়া তিন মোমকে জ্বালিয়ে দিলো।

আশার মোমটি বললো:

–জীবন থেকে কখনোই আশা দূর হওয়া উচিত নয়। এই আশার মাধ্যমেই প্রতিটি মানুষ তার বিশ্বাস, শান্তি আর ভালেবাসাকে রক্ষা করতে পারে।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৫

মৃত্যুদণ্ড

রাজা দেশের বড় কাঠমিস্ত্রিকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। খবর পেয়ে মিস্ত্রি মুষড়ে পড়লো। মুখে খাবার রুচলো না। রাতে শুয়েও ঘুম আসছিলো না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে সময় কেটে যেতে লাগলো। স্বামীর এই অবস্থা দেখে স্ত্রী বললো,

-আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আপনি নির্দোষ। তারপরও আল্লাহ যদি আপনার জন্য এই ফয়সালাই করে থাকেন, তাহলে আমাদের কিছুই করার নেই। আর আল্লাহ এক, কিন্তু মুক্তির দরজা অনেক।

কথাটা শুনে স্বামীর মন কিছুটা শান্ত হলো। ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলো দরজায় করাঘাতে। মিস্ত্রির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। হতাশা আর নিরাশার দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালো। কম্পিত হস্তে দরজার ছিটকিনি খুললেন। দরজা খুলেই হাত বাড়িয়ে দিলেন হাতকড়া পরানোর জন্য। দরজায় দাঁড়ানো প্রহরীদের দলনেতা বললো,

-গতরাতে রাজা মারা গিয়েছেন। যুবরাজ বলে দিয়েছেন, আপনাকে একটা রাজকীয় কফিন বানাতে। যেমনটা তার দাদার জন্য বানিয়েছিলেন।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৬

অবিবেচক

একখানা পর্ণ কুটিরে থাকে এক কাঠুরে। শিশু সন্তান রেখে স্ত্রী মারা গিয়েছে। ছোট শিশুকে দেখাশোনা, বনে গিয়ে কাঠ কাটা, দুটো কাজ একসাথে করাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তারপরও জীবিকার টানে বনে যেতে হয়।

কাঠুরের এক বিশ্বস্ত কুকুর আছে। ছেলেটাকে দোলনায় ঘুম পাড়িয়ে, কুকুরটাকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে কাঠুরে বনে গেলো। দুপুরে এসে দেখে, কুকুরটা ভালোই পাহারা দিয়েছে। শিশুটা কাঁদলেই কুকুরটা মুখ দিয়ে দোলনায় ধাক্কা দিচ্ছে।

একদিন দুপুরে ফিরতে দেরি হয়ে গেলো। দূর থেকেই কুকুরটার ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শোনা গেলো। কৃষকের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। অজানা আশংকায় শরীর কেঁপে উঠলো। কুকুরের আওয়াজটাও অস্বাভাবিক শোনাচ্ছিলো। বাড়ির দরজায় এসে দেখলো, কুকুরটা উঠোনে বসে বসে ঘেউ ঘেউ করছে, আর তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

কাঠুরের মাথা ঘুরে উঠলো। ভাবলো, শেষমেশ বিশ্বস্ত কুকুরটাই আমার ছেলেটাকে খেলো?

আগপিছ চিন্তা না করেই, হাতের রামদা দিয়ে কুকুরটার মাথাকে দু'টুকরা করে ফেললো। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকলো। দেখলো শিশুটা দোলনায় আপন মনে খেলছে। দোলনার নিচে একটা সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৭

খরগোশের আস্তানা

জিদ্দা নগরী। শহরতলির আবাসিক এলাকা। একজন ধনী শেখ বিলাসবহুল প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করলেন। বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করে বাসভবনটা নির্মাণ করা হলো। আরাম আয়েশের যাবতীয় ব্যবস্থাই মজুদ করা হয়েছে। আনন্দ-বিনোদনের নানাবিধ উপকরণ জড়ো করা হয়েছে।

প্রাসাদ এখন বসবাসের উপযুক্ত। শেখ তার বিশাল পরিবার নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠলেন। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের ছোটাছুটিতে পুরো বাড়ির চেহারাই বদলে গেলো। সুখে শান্তিতে প্রথম মাসটা কেটে গেলো।

পরের মাসে, এক রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে, শেখ দেখলেন তার এক নাতনি ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভীত দৃষ্টিতে একটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। শেখ কাছে গিয়ে অভয় দিয়ে ঘুমুতে পাঠিয়ে দিলেন।

শেখ নিজে গিয়ে বিষয়টা যাচাই করলেন। দেখলেন, দেয়ালের ভেতর থেকে অদ্ভুত এক খসখসে ভোঁতা আওয়াজ আসছে। শেখ ভয় পেয়ে

গেলেন। আরো ভালোভাবে অনুসন্ধান করলেন। আচানক আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেলো।

এরপর কয়েকদিন আওয়াজ বন্ধ থাকলো। দুয়েকদিন পর আবার আওয়াজ হতে লাগলো। আস্তে আস্তে আওয়াজের মাত্রাটা বেড়েই চললো। পরিবারের সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। আগে এক জায়গা থেকে আওয়াজ আসতো, এখন কয়েক জায়গা থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করলো। বিশেষ করে রাতের বেলায় আওয়াজের পরিমাণ বেড়ে গেলো।

শেখ বন্ধু-বান্ধবের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কেউ কোনও সমাধান দিতে পারলো না। শেষে এই ভুতুড়ে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেখ পরিবার-পরিজনসহ অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেই ভুতুড়ে বাড়ির সামনে 'ভাড়া হবে' লাগিয়ে দিলেন।

বিজ্ঞপ্তি দেখে ভাড়াটে এলো। তারাও সেই বিদঘুটে আওয়াজ শুনে ভয়ে পালিয়ে গেলো। ভুতুড়ে বাড়ি হিশেবে রটে গেলো। নতুন কোনও ভাড়াটে এলো না। বাড়িটা বিক্রি করে দেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রইলো না। কিন্তু কেনার জন্য কোনও ক্রেতাও ভয়ে এমুখো হচ্ছে না।

একদিন শহরে নতুন আসা ব্যক্তি, বাড়ি কিনতে এলো। তার কাছে খুব বেশি টাকাও ছিলো না। সে বাড়িটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করলো। প্রতিবেশিরা তাকে নিরুৎসাহিত করলো। ভয় দেখালো। তারপরো লোকটা ঠিকানা নিয়ে শেখের কাছে গেলো। দাম জানতে চাইলো। শেখ আনন্দের আতিশয্যে জানতে চাইলেন,

–কত আছে আপনার কাছে?

–আমার কাছে যা আছে, খুব সামান্যই।

– যাই থাক, আপনার কাছে তার বিনিময়েই আমি বাড়িটা বিক্রি করবো।

লোকটার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এত অল্প দামে একটা বাড়ির মালিক বনে যাবে সে?

লোকটা সদ্য কেনা বাড়িতে উঠে এলো। রাতে শুয়ে পড়ার পর, সেই আওয়াজটা শুরু হলো। লোকটা একটা কলম নিয়ে যে জায়গা থেকে আওয়াজ আসছিলো, দাগ দিয়ে রাখলো। এভাবে আরো কয়েক রাত কেটে গেলো। প্রতি রাতেই আওয়াজের স্থানগুলো নির্দিষ্ট করে রাখলো।

একদিন, দেয়ালের দাগ দেয়া জায়গাগুলো ভেঙে ফেললো। দেয়াল ভাঙার পর দেখা গেলো ওপাশে কতগুলো খরগোশ হুটোপুটি করছে।

অনুসন্ধান করে জানা গেলো, পাশের বাড়ির লোকেরা খরগোশ পোষে। খরগোশগুলো তাদের খোঁয়াড়ের ভেতর গর্ত খুঁড়ে এপাশে বের হয়ে আসে। দুই বাড়ির দেয়ালের মধ্যে সামান্য ফাঁকা জায়গাটাতে সেগুলো খেলা করে, হুটোপুটি করে। পরে আবার নিজেদের খোঁয়াড়ে ফিরে যায়। সঠিক অনুসন্ধান না করলে তিলও তাল হয়ে যায়।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৮

তাকদীরের লিখন

গভীর রাত। এক টগবগে যুবক বসে আছে। বসে বসে টিভিতে কী যেন দেখছে। আনন্দে মজে আছে। নামায-রোযা ভুলে, মজলুম মুসলিম ভাইবোনদের ভুলে। এমন সময় দরজায় আওয়াজ। ঠক ঠক ঠক।

–কে?

–আমি। আমি মালাকুল মাওত। মৃত্যুর ফিরিশতা। মৃত্যুদূত। যমদূত। আ য রা ঈ ল।

যুবকটির চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি টিভি বন্ধ করে দিলো। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে দিলো।

–আ-আপনি কেন এসেছেন?

–তোমার জান কবয করতে।

–আমি তো এখনো যুবক। অল্প বয়স। জীবনের হাসি-আনন্দ কিছুই উপভোগ করতে পারিনি। আমাকে একটু সময় দিন না।

–না, সময় দেয়া যাবে না। আমার তালিকায় তোমার নামই সবার আগে।

–অন্তত একটা মাস সময় দিন!

–একমাস দিয়ে কী করবে?

–এখন একটা বিশেষ ব্যাপার (বিশ্বকাপ) শুরু হয়েছে। এক মাসব্যাপী চলবে। ওটা দেখা শেষ করে নিই?

–ও মা! আমি তো ভেবেছিলাম, এখন রমযান মাস। তুমি ইবাদত-বন্দেগীর জন্য সময় চাচ্ছো। সেজন্য নাহয় আমি ভেবে দেখতাম। কিন্তু তুমি তো এখন রমযানের মতো পবিত্র মাসে অন্য কিছুর জন্য সময় চাচ্ছো। নাহ, তোমাকে সময় দেয়া যাবে না।

–আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এত কষ্ট করে এসেছেন, একটু বসুন। সামান্য নাশতা-পানি করুন।

যুবক নাশতা এনে দিলো। ফিরিশতা খেলেন (?)। যুবকটি নাশতার মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো। খাওয়ার পরপরই ফিরিশতা ঘুমিয়ে পড়লেন (?)। এই ফাঁকে যুবকটি তার নাম শুরু থেকে কেটে, তালিকার শেষে লিখে দিলো। ফিরিশতা ঘুম থেকে উঠে বললেন,

–(তুমি এতই যখন সময় চাচ্ছো) আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা বুদ্ধি ঠিক করেছি। আমি আজ তালিকার শেষ থেকেই জান কবয করা শুরু করবো।

জীবন জাগার গল্প : ১৮৭

কন্যাসন্তান

এক লোকের ছয় সন্তান। ছয়টাই মেয়ে। লোকটা তিতিবিরক্ত। একটা ছেলের আশায় আশায় এতগুলো মেয়ে হয়ে গেলো। লোকটা ঠিক করেছে, আরেকবার দেখবে। এবারো যদি মেয়ে হয়, প্রথমে গলাটিপে মেয়েটাকে মারবে। তারপর বউকে তালাক দিবে। দেখেশুনে আরেক বিয়ে করবে।

সপ্তম সন্তান জন্ম নেয়ার আগে। একরাতে লোকটা স্বপ্নে দেখলো, সে মারা গেছে। দুনিয়াতে তার কৃতকর্মের কারণে, বিচারে তাকে জাহান্নামে দেয়ার ফায়সালা হলো। মালিক (জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা) লোকটাকে কষে বাঁধলো। চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে ফেলার জন্য নিয়ে গেলো। জাহান্নামে ফেলার উপক্রম হতেই, বড় মেয়ে এসে ছোঁ মেরে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।

মালিক আবার লোকটাকে ধরে এনে দ্বিতীয় জাহান্নামের কাছে গেলো। এখানেও লোকটার দ্বিতীয় মেয়ে এসে তাকে বাঁচিয়ে নিলো।

এভাবে একে একে ছয়টা জাহান্নাম থেকেই বেঁচে গেলো।

লোকটা এবার ভয় পেয়ে গেলো। জাহান্নাম তো আরেকটা বাকি আছে। তার তো আর মেয়ে নেই। হায় হায় করে উঠলো। তাড়াতাড়ি মনে মনে আল্লাহব কাছে কাকুতি মিনতি করে দু'আ করতে শুরু করলো।

–ও আল্লাহ গো! আমাকে আরেকটা কন্যাসন্তান দান করুন।

এমন সময় নবজাতকের ওঁয়া ওঁয়া আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৯০

তাদের কৌশল

এক যুবক মসজিদে ওয়াজ শুনলো। হুযুর বলছেন,

–আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত গুরুতর।

এ কথা শুনে, যুবকটা ঠিক করলো, বিয়ের আগে নারীদের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিবে। তাহলে বিয়ের পর আর কোনো সমস্যা হবে না। সে একটা খাতা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। নানা দেশ-গ্রাম ঘুরে নারীদের যাবতীয় কৌশল সংগ্রহ করলো।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। গ্রামে প্রবেশের মুখেই মোড়লের সাথে দেখা।

–আরে তুমি! এতদিন কোথায় ছিলে? কোনও খোঁজখবর নেই। তোমার মাথার উপর এই খাতাগুলোই বা কিসের?

–আমি এতদিন ঘুরে ঘুরে নারীদের কৌশল সম্পর্কে জেনেছি। যা জেনেছি, খাতায় লিখে রেখেছি।

–আচ্ছা! তাই নাকি? এই কৌশলগুলো তো আমারও জানার প্রয়োজন আছে। তুমি আজ রাতটুকু আমার বাড়িতে থাকো। বাড়িতে আজ অনেক মেহমান আছে। আমি আগামীকাল তোমার সাথে কথা বলবো।

মোড়ল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বলে দিলেন,

–এই লোক আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেহমান। যথাযথ মেহমানদারির ব্যবস্থা করো। মোড়ল চলে গেলো। স্ত্রী যুবকটাকে জিজ্ঞেস করলো,

–এত খাতাপত্র কিসের?

–এগুলোতে নারীদের যাবতীয় কৌশল লেখা আছে। সবদেশ ঘুরে ঘুরে এই কৌশলগুলো সংগ্রহ করেছি।

–ওম্মা! তাই নাকি? নারীদের সমস্ত কৌশলই এই জাবেদা খাতাগুলোতে লেখা আছে?

–হ্যাঁ, স--ব।

একথা শুনে মোড়লের স্ত্রীর চেহারায় নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠলো। চোখ বড় বড় করে বললো,

–আপনি তো দেখি দারুণ গুণী লোক মশাই? বিপুল ধৈর্য আর মেধা ছাড়া তো এ কাজ কারো পক্ষে সম্ভব নয়!। আপনার মতো একজন বলবান-রূপবান যুবকের পক্ষেই এহেন দুরূহ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব।

–যাহ্ কী যে বলেন। এসব বোঝার জন্য তো মেধা থাকা চাই। এত দেশ ঘুরলাম, একমাত্র আপনাকেই আমার কাজের কদর করতে দেখলাম।

–আসলে আপনাকে দেখেই আমার ভালো লেগে গেছে।

–তাই?

–আপনাকে একটা কথা বলি?

–বলুন, বলুন, একটা কেন দশটা বলুন।

–আপনি তো দেখেছেন, আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ লোক। আমি তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

–আপনার কোনও সমস্যা থাকলে বলুন। আমি সমাধান করার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি করবো না।

–আমার স্বামী একটু পরে মেহমানদেরকে বিদায় দিতে বাইরে যাবেন। তখন আমার একটু সহযোগিতা লাগবে। আপনি 'ওখানে' একটু আসতে পারবেন?

–অবশ্যই আসবো।

যুবকটা সময়মতো 'ওখানে' হাযির হলো।

মোড়লের স্ত্রী আড়াল থেকে একটা ধারালো বটি হাতে বের হয়ে এলো।

–রে পাষণ্ড, নরাধম! তোর তো সাহস কম নয়। তুই একজন ভদ্র মহিলার অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিস? তুই দাঁড়া! আমি এখনি চিৎকার করে সবাইকে জড়ো করছি। তারা এসে তোকে টুকরো টুকরো করবে।

যুবক মোড়লের স্ত্রীর রণরঙ্গিনী-চণ্ডীমূর্তি দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। গলা শুকিয়ে খাঁ খাঁ কাঠ। কোনরকমে বললো,

–আমার ভুল হয়ে গেছে। এমন ভুল আর জীবনে হবে না।

–তুই নারীদের সব কৌশল শিখে ফেলেছিস না? নারীদেরকে তুই কী মনে করিস এ্যাঁ?

তুই নূহের হায়াত পেলে, কারূনের সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলে, আইয়ুবের সবর ধরলেও, নারীদের কৌশলের এক দশমাংশও জানতে পারবি না। এখন বল, কীভাবে তোর মৃত্যু কামনা করিস?

যুবকের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না। সে নিশ্চিত বুঝে গেলো, তার আর নিস্তার নেই। মৃত্যু তার মাথার উপর। তারপরও শেষ চেষ্টা করে দেখলো।

–আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। এমন কাজের চিন্তা ঘুর্ণাক্ষরেও আর মাথায় ঠাঁই দেবো না।

–নাহ, তোর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মরতে তোকে হবেই।

একথা বলেই মোড়লের স্ত্রী বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে সবাই কী হলো কী হলো করে ছুটে এলো।

যুবকটা ভয়ে আধমরা হয়ে গেলো। মোড়লের স্ত্রী এবার হাতের বটিটা উঁচিয়ে ধরতেই যুবক বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। এবার মোড়লের স্ত্রী দ্রুত ঠেলে ঠেলে যুবকটির মুখ সামনে রাখা খাবারের কাছাকাছি এনে রাখলো। মোড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো।

–কী হলো, কী হলো? আওয়াজ কিসের, বউ? মেহমান যুবক কোথায়?

মোড়লের স্ত্রী বললো,

–আমি খাবার এনে দিয়েছি। মেহমান খাবার দেখেই গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে, খাবার গলায় আটকে গিয়েছিলো। এখন দমবন্ধ হয়ে লোকটা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। আমি ভেবেছি লোকটা মরে গেছে, সেই ভয়ে চিৎকার করে উঠেছি।

আর এই মোটা গদা দিয়ে জোরে বাড়ি দিয়েছি যাতে গলায় আটকে থাকা খাবার বের হয়ে আসে। সামনের খাবারের দলাটা গলা থেকে বের হয়েছে।

স্ত্রী এবার যুবকের মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো। যুবক পিটপিট করে চোখ খুললো। অদূরে মোড়লকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভীত আর লজ্জিত হয়ে পড়লো। সে এখনো বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। মোড়লের স্ত্রী যুবকের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

–নারীদের এ ধরনের কৌশলের কথাও কি তোমার খাতায় লেখা আছে?

–না, আমি তাওবা করছি। আমি আসলে এতদিন নারীদের কৌশল সম্পর্কে কিছুই লিখে উঠতে পারিনি। সত্যিই তাদের কৌশল অপার অসীম।

জীবন জাগার গল্প : ১৯১

শিশুর নামায

সেনেগালের 'আবজান' শহরের এক শিশু। নাম আবদিউফ। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। ক্লাসে স্যার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন,

–ফজরের নামায পড়লে সব পাওয়া যায়। এই নামায যারা পড়ে, তারা আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দা।

আবদিউফ একথা শুনে ঠিক করলো সে-ও আজ থেকে ফজরের নামায পড়বে। বিকেলে বাড়ি এলো। তার দশটা তিতির পাখি আছে। সেগুলোকে খুদ-কুঁড়া দিলো। রাতে খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। আবদিউফ ভাবলো, সে ফজরের নামাযের সময় কিভাবে ঘুম থেকে জাগবে? তার বাড়িতে তো কেউই নামায পড়ে না।

ঠিক করলো সারারাত জেগে থাকবে। আযান হলে মসজিদে যাবে। আযান শোনার পর ঘর থেকে বের হলো। কিন্তু তখনো বাইরে অন্ধকার। একা বের হতে তার ভয় করছিলো। মন খারাপ করে দাওয়ায় চুপচাপ বসে রইলো। কিছুক্ষণ পর রাস্তা থেকে কাশির আওয়াজ শোনা গেলো। আবদিউফ দৌড়ে রাস্তায় এলো। দেখলো, সহপাঠি আহমাদুগলোর দাদা মসজিদে যাচ্ছেন।

সেও পিছু পিছু হাঁটা দিলো। বাড়ির সবাইকে না জানিয়ে এভাবেই সে নামায পড়া চালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন সে স্কুল থেকে এসে শুনলো, আহমাদুগলোর দাদা মারা গেছেন।

–ও আচ্ছা! সেজন্যই আজ আহমাদুগলোকে স্কুলে দেখা যায়নি। মৃত্যুর সংবাদ শুনেই আবদিউফ কান্না শুরু করলো। মা-বাবা তো অবাক। আব্বু জিজ্ঞেস করলেন,

–তুমি এমন কাঁদছো কেন? উনি তো তোমার কোনও আত্মীয় নন। এমনকি তোমার সমবয়েসীও নন। তার মৃত্যুতে তোমার এত শোকাহত হওয়ার কোন কারণ তো দেখছি না?

–আব্বু! উনি তোমার চেয়ে ভালো ছিলেন। উনি আমার অনেক উপকার করতেন। তার কারণে আমি খুব ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

বাবা ভীষণ অবাক হলেন। জানতে চাইলেন,

–কিভাবে?

এবার আবদিউফ এতদিনকার ঘটনা খুলে বললো। কয়লার খনিতে কাজ করা বাবা লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললেন।

জীবন জাগার গল্প : ১৯২

রাজার ছবি

ফ্রান্সের ভ্যানঘগ ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস। সারা বিশ্বের শিল্পীদের স্বপ্নের জায়গা। এখানে ভর্তি হতে পারা মানেই হলো, একজন ডাকসাইটে শিল্পী হিসেবে জাতে উঠে যাওয়া।

আজকের ক্লাসের বিষয় ছিলো সৃজনশীল চিন্তার অংকন। অধ্যাপক আঁদ্রে মালয় ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ইজেলটা হালকা নাড়াচাড়া করছেন। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

–আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো। সেই গল্পের চাহিদা মোতাবেক তোমাদেরকে ছবি এঁকে জমা দিতে হবে। গল্পটা শোনো!

–দেশের রাজা বেশ শিল্পরসিক। তার অনেক দিনের শখ, নিজের একটা সুন্দর ছবি আঁকাবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও শিল্পীই তার সুন্দর একটা ছবি এঁকে দিতে পারলো না।

ছবি সুন্দর হবে কিভাবে? রাজার যে এক চোখ কানা, একটা পা ল্যাংড়া! এক পায়ের হাঁটু থেকে নিচের অংশটা নেই। মানুষ নিখুঁত হলে তার ছবিও নিখুঁত হবে। তার মধ্যেই যেহেতু খুঁত, ভালো ছবি কিভাবে হবে?

আগে যারাই রাজার ছবি এঁকেছে, তারা কানা আর ল্যাংড়া রাজার ছবিই এঁকেছে।

অধ্যাপক বললেন,

–আমার গল্প শেষ। তোমরা রাজা খুশি হয় মতো করে ছবি এঁকে জমা দাও।

সবাই ছবি জমা দিলো। অধিকাংশই রাজার নিখুঁত ছবি এঁকে জমা দিলো। রাজরা দুচোখই ভালো। কোনো পায়েই সমস্যা নেই। সুন্দর পরিপূর্ণ নিখুঁত এক রাজার ছবি।

অধ্যাপক একটা একটা ছবি দেখছেন আর মন্তব্য করছেন,

–তোমরা তো রাজার মিথ্যা ছবি এঁকেছো। রাজার বাস্তব ছবি তো আঁকোনি?

–কিন্তু স্যার, আসল চেহারা আঁকলে রাজা নাখোশ। আর নিজ থেকে বানিয়ে সুন্দর ছবি আঁকলে আপনি নাখোশ। কোন দিকে যাই? উভয়কে খুশি করে ছবি আঁকা তো অসম্ভব।

অধ্যাপকের দৃষ্টি একটা ছবিতে আটকে গেলো। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আপন মনেই বলে উঠলেন,

–অবশ্যই সম্ভব। এই যে দেখো!

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারা দেখলো,

–একজন রাজা হাঁটু গেড়ে বসা। একচোখ বন্ধ করে বন্দুক তাক করে আছেন। সামনের দিক থেকে একটা মত্ত সিংহ রাজার দিকে ছুটে আসছে।

অধ্যাপক বললেন,

–দেখো, হেনরি আজকের ছবি আঁকায় যে সৃজনশীলতা দেখিয়েছে, তার কোন তুলনাই হয় না। একটা ছবিতেই সে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। যেমন,

এক. রাজার কানা চোখটাতে বন্দুক বসিয়ে দিয়েছে। ব্যস, আর ধরার উপায় নেই চোখটা কানা। বন্দুক তাক করার সময় তো এমনিতেই এক চোখ বন্ধই থাকে।

দুই. শিকারের সময় একটা পা মুড়েই বন্দুক তাক করা হয়। এখানেও রাজার যে একটা পায়ের অর্ধেক নেই সেটা বোঝাই যাচ্ছে না।

তিন. একটা সিংহ ছুটে আসছে আর রাজা বন্দুক তাক করে আছেন। এমন দৃশ্যে রাজার বীরত্ব আর সাহসিকতা ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হেনরির সুন্দর মানসিকতা।

চার. সে একজন খোঁড়া মানুষকে শৈল্পিকভাবে নিখুঁত করে উপস্থাপন করেছে। বড়ই সুন্দর আর সুবাসিত মানসিকতা।

আমরাও বাস্তব জীবনে ইচ্ছা করলে অন্যের ভুলত্রুটিগুলো আড়াল করে, তাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৩

বেদনার ভার

দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত এক যুবক। নানাবিধ বিপদাপদে পাগলপ্রায়। পরামর্শের জন্য এক জ্ঞানীলোকের কাছে গেলো।

–আমি ভীষণ বিপদে আছি। আমার দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আমাকে এর থেকে পরিত্রাণের একটা উপায় বাতলে দিন।

–আমি তোমাকে দুইটা প্রশ্ন করবো। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

–জি, জনাব। আমি যথাযথ উত্তর দেবো।

–তুমি যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলে, এই বিপদাপদগুলো কি তোমার সাথে ছিলো?

–জি না।

–যখন তুমি পৃথিবী থেকে চলে যাবে, তখনো কি এই বিপদাপদগুলো তোমার সাথে কবরে যাবে?

–জি না।

–যে বিষয়গুলো তোমার জন্মের সময় ছিলো না, আবার মৃত্যুর পরেও সাথে করে নিয়ে যাবে না, সেগুলো কি এত বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে?
–জি না, জনাব।
–তাহলে তুমি পার্থিব বিষয়গুলোতে ধৈর্য ধারণ করো।
তোমার দৃষ্টিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করো, তাহলে যা চাও তাই পাবে।
–ঠিক আছে, জনাব।
–সর্বদা হাসিখুশি থেকো। কারণ,
তোমার রিযিক তো নির্দিষ্ট হয়েই আছে। তোমার তাকদীর লেখা হয়ে আছে। তুমি সবসময় আল্লাহর সামনেই আছো। এত কিছুর পরও, দুনিয়ার পেরেশানি তোমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে কিভাবে?

জীবন জাগার গল্প : ১৯৪

পতিব্রতা স্ত্রী

স্বামীদের নিয়ে আলোচনা চলছে। হাতের কুশি কাটা দিয়ে উলের জামা বুনতে বুনতে প্রথম মহিলা বললেন,
–আমার স্বামী নিয়মিত নামায পড়তেন না। অনেক বলে কয়ে নামায ধরিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হলো ফজরের নামায নিয়ে। কিছুতেই ঘুম ভাঙানো যেত না। আমি অনেক চিন্তা করলাম। একদিন ফজরের সময় উঠে, আমার হাতটা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিলাম। উনি আবার সুগন্ধি পছন্দ করেন। দু'হাতে সুগন্ধি মেখে নিলাম। এরপর তার মাথায় আর মুখের উপর আলতো করে হাত বুলাতে শুরু করলাম।
হাতের শীতল ছোঁয়া আর সুগন্ধি পেয়ে তিনি অবাক হলেন। বললেন,
–তুমি আমাকে জাগানোর জন্য এত কষ্ট করে প্রস্তুতি নিয়েছো? আর থাকতে পারলেন না। উঠে নামায পড়লেন।
দ্বিতীয় মহিলা বললেন:
আমার স্বামীর স্বভাবে খুবই রুক্ষ আর রূঢ় ছিলেন। কথায় কথায় রেগে যেতেন। দুর্ব্যবহার করতেন। আবার আমাকে সন্দেহও করতেন।

একদিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় অবহেলাভরে বললেন,

–বন্ধুদের সাথে এক জায়গায় যাচ্ছি। তোমার কি কিছু লাগবে?

–না, আমার কিছু লাগবে না। আপনি দেরি করবেন না। কারণ কিছুক্ষণ পর বিদ্যুৎ চলে যাবে, ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। একথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন,

–তোমাকে কে বললো, বিদ্যুৎ চলে যাবে?

–আমি কথাটা আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছি। আপনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়। আপনি আসলেই ঘরটা আলোকিত হয়ে যায়। তিনি হেসে দিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসার আগ্রহ নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

তৃতীয়জন বললেন:

আমার স্বামী একবার বাইরে গেলে আর কোনও খোঁজ থাকতো না। অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে যান। কোথায় যান, কী করেন কিছুই বলেন না। কোনও খবরও দেন না। আমি একবার করলাম কি, ওনার ব্যাগ গুছিয়ে দেয়ার সময় কাপড়ের ভাঁজে একটা চিঠি গুঁজে দিলাম। চিঠিতে তার প্রতি আমার ভালোবাসার কথা লিখলাম। তাকে ছাড়া আমার জীবনের শূন্যতার কথা লিখলাম। তিনি না থাকলে আমার ও সন্তানদের কী অবস্থা হয় সেটাও জানালাম। এভাবে তিনি বাইরে কোথাও গেলেই আমি চিঠি লিখে রেখে দিতাম। এতে করে দেখলাম, ওনার আচরণে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসছিলো। একবার মন খারাপ থাকায় চিঠি দিলাম না। তিনি ফিরে এসে বললেন,

–তোমার এবারের চিঠিটা আমি পড়তে পারি নি। হয়তো কোথাও পড়ে গেছে। আমি তিন-চারবার পুরো ব্যাগ খুঁজে দেখেছি, পাইনি।

–আমি অনুতপ্ত হলাম। বুঝতে পারলাম চিঠি না লেখাটা ভুল হয়েছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি যেসব ভালো কাজ করে অভ্যস্ত, সেগুলো কোনও অবস্থাতেই ছেড়ে দেবো না।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৫

কুরআনময় জীবন

অনাড়ম্বর এক খানকা। গ্রাম থেকে দূরে। পাহাড়ের পাদদেশে। বনের প্রান্ত ঘেঁষে। নদীর কুল ছাপিয়ে। নিরিবিলি। নদীতে একটা ছোট নৌকা পানিতে হেলছে-দুলছে। মাঝি গলুইয়ে বসে আছে। ছোট ছইয়ের ভেতরে দু'জন লোক বসা। একটু পরেই নৌকা ছেড়ে দেবে। ভেতরে দু'জন মানুষ কথা বলছেন। একজন বয়োবৃদ্ধ, আরেকজন চল্লিশোর্ধ। দুজনের চোখই অশ্রুসজল। বয়স্কজন বললেন,

–তুমি আমার কাছে তেত্রিশ বছর ছিলে। রিয়াজত-মুজাহাদা, মুরাকাবা-মুশাহাদা করেছো। আমার খিদমত করেছো। খানকায় আগত মেহমানদের খিদমত করেছো। আচ্ছা, কী শিক্ষা নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরছো?

মুরীদ: আমি এত বছরে, আপনার কাছ থেকে আটটা বিষয় শিখেছি।

শায়খ: মাত্র আটটা বিষয়? কী কী সেগুলো?

মুরীদ: সেগুলো হলো-

প্রথম শিক্ষা:

আমি সৃষ্টিকুলের দিকে তাকিয়েছি। দেখেছি প্রতিটি সৃষ্টিই তার প্রিয়জনকে ভালোবাসে। এক সময় প্রিয়জন যখন কবরে চলে যায়, তখন একজন আরেকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু নেক কাজই সাথে থাকে।

আমি নেক কাজকে আমার প্রিয়জন বানিয়েছি। কবরে গেলে নেক কাজও আমার সাথে কবরে যাবে।

দ্বিতীয় শিক্ষা:

আল্লাহ বলেছেন, (আর যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রেখেছে তার বাসস্থান হবে জান্নাত নাযি'আত: ৪০-৪১)।

এই আয়াত পড়ে, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে। যাতে প্রবৃত্তি আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয় এবং এর উপরই অটল থাকে।

তৃতীয় শিক্ষা:

আমি আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিয়ে ভেবেছি। দেখেছি কারো কাছে মূল্যবান কিছু থাকলেই সে তটস্থ থাকে, কখন বস্তুটা হারিয়ে যায়। তাই সে বস্তুটার হেফাযতে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। আমি আল্লাহর বাণীর প্রতি মনোযোগ দিয়েছি, সেখানে আছে,

-(যা তোমাদের কাছে আছে, সেটা ফুরিয়ে যাবে। আর যা আল্লাহর কাছে আছে, তা বাকি থাকবে। নাহল:৯৬)

আমার হাতে মূল্যবান কোনও কিছু আসলেই সেটাকে আল্লাহর হেফাযতে রেখে দিয়েছি। তিনিই এর হেফাযত করবেন।

চতুর্থ শিক্ষা:

মানুষকে দেখি গর্ব করতে। সে সম্পদ,সন্তান, বংশ-কৌলীন্য ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করে। সম্মানের দাবি করে। আমি দেখলাম আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

-(নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। হুজুরাত:১৩)।

আমি তখন থেকেই তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করতে শুরু করেছি। যেন আল্লাহর কাছে সম্মানিত হতে পারি।

পঞ্চম শিক্ষা:

মানুষ সবসময় একে অপরের সমালোচনা করে। একে অপরকে অভিশাপ দেয়। চিন্তা করে দেখলাম, এর কারণ হলো, হিংসা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(আমি দুনিয়ার জীবনে, তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বন্টন করে দিয়েছি যুখরুফ:৩২)।

আমি হিংসা ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের প্রতি হিংসা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছি। আমি তো জানি রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমার হিংসা করে কোনো লাভ নেই।

ষষ্ঠ শিক্ষা:

মানুষকে সবসময় দেখি একে অন্যের উপর জুলুম করে। একে অপরের সাথে লড়াই করে। পরস্পরকে হত্যা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকেই শত্রুরূপে গ্রহণ করো। ফাতির:৬)।

সেদিন থেকে আমি মানুষের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা ছেড়ে দিয়েছি। একমাত্র শয়তানকেই শত্রুরূপে গ্রহণ করেছি।

সপ্তম শিক্ষা:

সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, মানুষ জীবিকার জন্য কী কষ্টই না করে। কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করে। আমার সামনে একটা আয়াত সব সময় জ্বলজ্বল করে।

–(ভূপৃষ্ঠে প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্বই আল্লাহর হাতে। হুদ:৬)।

আমিও তো একটি প্রাণী। আমার রিযিকের দায়িত্ব তো আল্লাহর হাতে। তাই আমি আল্লাহর জন্য আমার যা করণীয়, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছি। আর আমার জন্য আল্লাহর যা করণীয় সেটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি।

অষ্টম শিক্ষা:

মানুষকে দেখেছি, সে সবসময়ই তারই মতো আরেক মাখলূকের উপর ভরসা করে। কেউ সম্পদের উপর ভরসা করছে। কেউ পরিবারের উপর ভরসা করছে। কেউ ভরসা করছে নিজের তাগড়া শরীরের উপর। কেউবা বড় পদের উপর ভরসা করছে। আবার কেউ দৈহিক সৌন্দর্যের উপর ভরসা করছে। আর আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন,

–(যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

(তালাক: ৩)।

আমি বান্দার উপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার মেহনত শুরু করেছি।

শায়খ বললেন,

বাছা! তুমি সবকিছুই শিখে গেছো। এখন নিজভূমে গিয়ে এর উপর আমল চালিয়ে যাও। অন্যদেরকেও এই শিক্ষার উপর আনার মেহনত করতে থাকো। আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা অনেক বড় কাজ নিবেন। ইনশাআল্লাহ।

যাও নৌকায় উঠে পড়ো। বাড়ি পৌঁছে খবর দিও। ফী আমানিল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৬

আবেগময় মামলা

সিরিয়ার হলব। বর্তমানে ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। এই শহরের কোর্টে একবার এক অদ্ভুত মামলা এলো। দুই ভাইয়ের মামলা। হিরাব আর যিরাব দুই ভাই। পিতা মারা গেছেন বছর দুই আগে। হিরাব বড়, যিরাব ছোট।

শিক্ষাদীক্ষায় ছোট ভাই এগিয়ে। বড় ভাই নানা সাংসারিক ঝামেলায় লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেনি। যিরাব লেখাপড়া শেষ করে দামেস্কেই থেকে গেছে। বিয়েথাও ওখানে করেছে। বেশ ভালো অবস্থা।

হিরাব থাকে হলবে। বাবার ব্যবসাটা দেখাশোনা করে। ব্যবসাটা একটু অদ্ভুত। শামুকের খোলের গুঁড়ার ব্যবসা। এটা দিয়ে এক ধরনের চুন বানানো হয়। কিন্তু ইদানীং ব্যবসাটা ভালো যাচ্ছে না। সংসারে টানাটানি লেগেই আছে।

ওদিকে যিরাব বেশ অবস্থাপন্ন। তার ইচ্ছা, এখন থেকে মাকে নিজের সাথে রাখবে। এতদিন গুছিয়ে বসতে সময় লেগেছে। সে আগেই ভাইয়াকে বলে রেখেছে। ভাইয়া হাঁ বা না কিছু বলেননি। এবার ঈদের সময় বাড়িতে এসে কথাটা মায়ের কাছে পাড়লো। আম্মু বললেন,

–তুই তোর বড় ভাইকে বল। সে সম্মতি দিলে আমার আপত্তি নেই।

যিরাব ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললো:

–ভাইয়া, এবার কিন্তু আম্মুকে আমি সাথে করে নিয়ে যাবো।

–নিয়ে যাবি মানে?

–আম্মা এবার থেকে আমার কাছেই থাকবে।

–কেন? এতদিন তো আমি আম্মার সাথেই ছিলাম। এখনো আগের মতো থাকতে সমস্যা কোথায়?

ব্যাপারটা নিয়ে দুই ভাইয়ের মাঝে অনেক কথা হলো। দুই ভাইয়ের কোন ভাইই নিজের অবস্থান থেকে সরতে রাজি নয়। পাড়ার মুরুব্বিরাও আপোস করে দেয়ার চেষ্টা করলেন। হলো না। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোর্ট

পর্যন্ত গড়াল। এই অদ্ভুত মামলার কথা শুনে উকিল পর্যন্ত থ। মামলার কথা পুরো শহরে চাউর হয়ে গেলো। মামলা আদালতে উঠার দিন আদালতপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। এমন হৃদয়স্পর্শী মামলা তারা ইহজীবনে দেখেনি।

হাকিম কী রায় দেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছে সবাই।

বিচার বসলো। উকিল প্রথমে ছোট ভাইয়ের জবানবন্দী নিলো।

–আপনি আপনার আম্মাকে আপনার কাছেই রাখতে চান?

–জি।

–কেন? এতদিন আপনার বড় ভাইয়ের কাছে ছিলো। এখনো থাকতে সমস্যা কোথায়?

–সমস্যা নেই। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন কথা হয়েছিলো যে, আমি চাকরি বাকরি পেয়ে থিতু হয়ে বসলে আম্মাকে সাথে করে রাজধানীতে নিয়ে যাবো। আর এতদিন তো আম্মু ভাইয়ার কাছে ছিলেন। এখন থেকে আমার কাছে থাকাটাই তো যৌক্তিক।

উকিল বড় ভাইয়ের কাছে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

–আপনার আম্মা আপনার সাথেই থাকে?

–জি না।

–তাহলে?

–আমি আমার আম্মার সাথে থাকি।

–দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?

–আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমার কাছে থাকার অর্থ হলো, আম্মা আমার অনুগ্রহে আছেন। আর আমি আম্মার সাথে আছি, এ কথার মানে হলো, আমি আম্মার অনুগ্রহে আছি। মা-ই ছেলেকে অনুগ্রহ করেন। কখনোই ছেলে মাকে অনুগ্রহ করতে পারে না।

–কিন্তু উনি তো আপনার রোজগারের টাকাতেই চলেন।

–আমিটা 'আমি' কিভাবে হলাম? কখন হলাম? আপনার সহকারী যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে থেকে ব্যবসা করেন, তার মালিক কে হয়, আপনি নাকি সহকারী?

–অবশ্যই আমি মালিক হবো।

–এখানেও ব্যাপারটা সেরকম। আমি যা-ই করি, তার মূল হকদার মা-ই হবেন। আমি বড়জোর তার অধীনে চাকর বা সহকারীর ভূমিকা পালন করছি মাত্র। আমার সবকিছুই আমার মায়ের। যতদিন তিনি জীবিত আছেন, ততদিন এর ব্যতিক্রম হবে না।

উকিল আর কথা বাড়ালেন না। হাকীমকে বললেন,

–মাই লর্ড। মহামান্য আদালত উভয় পক্ষের কথা শুনেছে। উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ দাবিতে অটল। মাননীয় আদালত বিশেষ বিবেচনায় একটা সিদ্ধান্তে আসবে বলে আমি আশা করি। হাকীম বললেন,

–এখানে আসলে রায় দেয়ার কিছু নেই। একজন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতেই রায়টা নির্ধারিত হয়ে যাবে। তিনি হলেন দুই ভাইয়ের মা। ওনার মতামত নেয়া হোক। তিনি যা বলবেন তাই হবে। মাকে আনা হলো। হাকীম মায়ের দিকে ফিরে বললেন,

–আপনি মা হিসেবে অত্যন্ত ধন্য। যে মায়ের সন্তানরা তাকে নিজের কাছে রাখার জন্য কোর্টে মামলা করতে আসে, সেই মায়ের চেয়ে সুখী মা আর কে? এখন আপনিই ঠিক করুন। আপনি কোন ছেলের সাথে থাকবেন? মা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

–আমি ছোট ছেলের সাথেই থাকতে চাই। এ কথা বলেই মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

–আপনি কেন ছোট ছেলের কাছে থাকাটা বেছে নিলেন?

–আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমার বড় ছেলের আয়-রোজগার কম। কিন্তু সেটা কোনও সমস্যা নয়।

–তাহলে সমস্যা কোথায়?

–সমস্যা হলো, তার রোজগারের প্রায় পুরোটাই আমার ওষুধ-পথ্যের পেছনে খরচ হয়ে যায়। আমার জন্য ভালোমন্দ খাবার রান্নার পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। বড় বৌমাটাও মাশাআল্লাহ, হীরের টুকরো। আমার আদরের তিনটা নাতনি আছে। আমার পেছনে সব টাকা খরচ হয়ে যাওয়াতে, তাদের খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো হয় না। লেখাপড়ার খরচ চলে না। বড় ছেলেটা আবার ছোট ছেলে থেকেও সাহায্য নিতে রাজি নয়। এসব দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৭

মুসলিম-খ্রিস্টান বিতর্ক

আব্দুল্লাহ জাবির। লেবাননের শঙ্কর পরিবারের মুসলিম। মা মেরোনাইট খ্রিস্টান, বাবা মুসলিম। সেই সুবাদে উভয় ধর্ম সম্পর্কে বেশ ভালো জানাশোনা। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মকর্মের বিশেষ ধার না ধারলেও ধর্মীয় আলোচনায় বেশ আগ্রহী। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় বিতর্কের পরিবেশেই বড় হয়েছে। উভয় ধর্মের যুক্তিতর্কের নানা দিক ছিলো নখদর্পণে।

বাবা তাহহান খালাফ ছিলেন বিশ্বব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার চাকরি ছিলো আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো রিপাবলিকে।

জাবির লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে জিয়োলজিতে (ভূগোলে) অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে এম বিএ করার জন্য লন্ডন গেলো। বাবার পরিচয়ের সুবাদে লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকসে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলো। বাবার বন্ধু অধ্যাপক হেরাল্ড জার্ড এ ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করেছেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আব্বু বললেন কঙ্গোতে বেড়াতে যেতে। আম্মুও বারবার বলছেন। ছোটবোন রাদিয়া তো ফোনের পর ফোন করে অস্থির করে ফেললো।

আব্বু আগেই টিকেট কেটে রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে হিথরো থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে চড়ে বসলো। আসন মিলিয়ে বসতে গিয়ে দেখলো তার পাশের আসনে একজন 'নান' বসে আছেন। বিমান ছেড়ে দিলো। চুপচাপ বসে থাকলে খারাপ দেখায়। টুকটাক কথা চলতে লাগলো। জাবির আলোচনা থেকে জানতে পারলো, সহযাত্রী নান একজন ব্রিটিশ। ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে থিওলজিতে (ধর্মতত্ত্ব) গ্র্যাজুয়েট। কঙ্গোতে যাচ্ছে নান হিসেবে যোগ দেয়ার জন্য। আগেও একবার গিয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ভ্যাটিকান গিয়েছিলো। ওখান থেকেই লন্ডন হয়ে কর্মস্থলে ফিরছে।

জাবিরের কথাবার্তা শুনে, মার্গারেট (নান) ভেবেছিলো জাবির একজন আরব খ্রিস্টান। পরে তার ভুল ভাঙলো। দু'জনের আলোচনা আস্তে আস্তে ধর্মের দিকে মোড় নিচ্ছিলো। দীর্ঘ যাত্রাপথে দু'জনের মধ্যে তর্কের ঝড় বয়ে গেলো। নিচে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুই তুলে ধরা হলো:

জাবির: এই বিশ্বজগৎ এবং মানব-দানব কে সৃষ্টি করেছেন?

মার্গারেট (নান): ঈশ্বর।

জাবির: আল্লাহ কে?

মার্গারেট (নান): জেসাস।

জাবির: আপনার কথা থেকে কি আমি এটা ধরে নেবো যে, ঈসা তার মাতা মারইয়ামকে সৃষ্টি করেছেন? এমনকি ঈসা তার আগে জন্ম নেয়া নবী মুসাকেও সৃষ্টি করেছেন?

মার্গারেট (নান): জেসাস ঈশ্বরের সন্তান।

জাবির: ঈসা যদি আল্লাহর সন্তানই হন, তাহলে আপনি কি এই বিশ্বাসও করেন:

তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে?

মার্গারেট (নান): হ্যাঁ।

জাবির: তাহলে আমি কি একথা বুঝে নেবো, আল্লাহ তার সন্তানকে শূলে চড়ানো থেকে বাঁচাতে সক্ষম হননি?

মার্গারেট (নান): ঈশ্বর তার সন্তানকে পাঠিয়েছেন, মানবজাতির পাপমোচনের জন্য। আমি বোঝাতে চাইছি, ঈশ্বর কুমারী মারইয়ামের গর্ভে নেমে এসেছেন। জেসাসকে জন্ম দিয়েছেন। তারপর জেসাসের দেহধারণ করেছেন।

জাবির: তাহলে আল্লাহ তার মায়ের পেটে প্রবেশের জন্য যমীনে নেমে এসেছেন। নয়মাস ভ্রূণ অবস্থায় থেকেছেন, ময়লা খাবার খেয়েছেন, রক্তমাখা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তারপর বেড়ে উঠেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন, অতঃপর বড় হয়েছেন, সহচরদেরকে শরীয়ত শিক্ষা দিয়েছেন, একসময় ইহুদিরা তার উপর খেপে উঠেছে, তিনি ইহুদিদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছেন (যেমনটা আপনাদের কিতাবুল মুকাদ্দাসে আছে), ইহুদিরা তার খোঁজে নেমে পড়েছে, ঈসার এক সহচর তার আত্মগোপনের

স্থান ফাঁস করে দিয়েছে, ইহুদিরা ঈসাকে সেখান থেকে ধরে এনেছে, শূলে চড়ানোর জন্য বধ্যভূমিতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেছে, তারপর কাঁটার মুকুট পরানো হয়েছে, অতঃপর অম্ল-তিক্ত একপ্রকার পানীয় পান করানো হয়েছে, এরপর তাকে হত্যা করা হয়েছে, এরপর তাকে দাফন করা হয়েছে, তিনদিন পর (আকাশে আরোহণের জন্য) তিনি কবর থেকে উঠে এসেছেন। এখন আমাকে বলুন এত কষ্ট, এত যাতনা, এত গঞ্জনা কেন?

আপনি কি এমন একজনকে নিজের প্রভু হিসেবে মেনে নিতে রাজি হবেন, যিনি বর্বর ইহুদিদের হাতে এভাবে কুখ্যাত অপরাধীর মতো নির্যাতিত হয়েছেন আইনবহির্ভূতভাবে?

ইনিই কি এই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, জ্বিন-ইনসান, নবী-রসূল সৃষ্টি করেছেন?

তিনি যদি কবরে মৃতই থাকেন, সেই তিনদিন পৃথিবীর যাবতীয় কার্যক্রম কে পরিচালনা করলো? আপনি যদি বিশ্বাস করেন, ঈসা একজন ইলাহ। কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মলাভ করেছেন। তাহলে তো আদমই (আ.) ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে। কারণ তিনি পিতা-মাতা দুজন ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন। ঈসাকে শূলে চড়ানো হয়েছে, এটা তো বিশ্বাস করেন?

মার্গারেট (নান): জি।

জাবির: যখন বাইবেলের লূক (৪১- ৩৬:২৪) আর দ্বিতীয় পুস্তক থেকে (২৩- ২২:২১) এই শ্লোকটা শুনি,

(যাকেই শূলে চড়ানো হবে, সেই অভিশপ্ত)।

তখন মনে প্রশ্ন জাগে,

ঈসা কি নিজ থেকেই অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন?

মার্গারেট (নান): এমনটা তো কোন খ্রিস্টানই দাবি করে না। মেনে নিবে না।

জাবির: আরেকটু শুনুন:

শৌল, যাকে আপনারা পল বলে ডাকেন। এই লোক তো আপনাদের কাছে পবিত্রতম মানুষ। সে গালাতিয়ার অধিবাসীদের কাছে লেখা চিঠিতে (৩/১৩) বলেছিলো:

(নিশ্চয় মাসীহ শরীয়তের অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য, আমাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে দিয়েছেন। যেহেতু তিনিই আমাদের জন্য অভিশাপে পরিণত হয়েছিলেন। কারণ বাইবেলে লেখা আছে, যাকেই শূলে চড়ানো হবে সেই অভিশপ্ত)।

আপনি কি জানেন? আমরা মুসলমানরাও মাসীহকে ভালোবাসি। আপনাদের চেয়েও আমরা তাকে বেশি পবিত্র আর নিষ্পাপ মনে করি?

মার্গারেট (নান): আপনি তো আমাকে লা-জওয়াব করে দিলেন। আমি বিষয়গুলো নিয়ে ভাববো। অভিজ্ঞদের সাথে কথা বলবো।

বিমান ততক্ষণে কঙ্গোর আকাশে পৌঁছে গেছে। বিমান থেকে নেমে যে যার পথে চলে গেলো।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৮

আব্বুর উপহার

তায়িফ লেখাপড়ায় ভালো। পরীক্ষায় সবসময়ই এক দুইয়ের ভেতরেই থাকে। এইবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে। ক্লাস টেস্টে সে প্রতিটি বিষয়ে গড়ে ৮৫% করে নাম্বার পেলো। আম্মু নাম্বারের কথা শুনে ভীষণ খুশি হলেন। বললেন,

–তোর আব্বুও শুনলে খুব খুশি হবেন।

রাতে আব্বু অফিস থেকে ফিরলেন। তায়িফ গিয়ে মার্কশিট দেখালো। আব্বুও খুব খুশি হলেন। আব্বু বললেন,

–চূড়ান্ত পরীক্ষায় যদি আরো ভালো করতে পারো, তুমি যা চাও পাবে।

–আব্বু আমি ভার্সিটিতে ভর্তির আগে একটা বাইক চাই।

–ঠিক আছে। তবে শর্ত হলো ফল আরো ভালো করতে হবে।

–ঠিক আছে আব্বু।

তায়িফ দিনরাত পড়াশুনা চালিয়ে গেলো। আব্বু-আম্মুও সারাক্ষণ তার সাথে সাথে থাকলেন। রাত জেগে পড়াশুনার সময় পালাক্রমে জেগে থাকলেন। গরম দুধ আর রঙ চা ইত্যাদি বানিয়ে তাকে সাহস যুগিয়ে গেলেন।

একসময় পরীক্ষা শেষ হলো। ফল বের হলো। তায়িফ দুরু দুরু বুকে ফলাফল আনতে গেলো। আনন্দে তার চোখের পানি এসে পড়লো। পরীক্ষায় সে আশাতীত ফল করেছে।

তার গড় নাম্বার নব্বইয়ের কাছাকাছি। আব্বু অফিসে বসেই খবর পেয়েছেন। আম্মুই জানিয়ে দিয়েছেন। বিকেলে আম্মুকে বলে প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে গেলো। ক্লাসের সবাই মিলে দেখা করতে যাবে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো। বাসায় এসে আম্মুকে জিজ্ঞেস করলো,

–আব্বু কোথায়?

–স্টাডি রুমে আছেন।

–আব্বু, আসবো?

–জি, এসো।

আব্বু উঠে এসে তায়িফকে জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখে আনন্দাশ্রু।

–আব্বু! আমার উপহার কোথায়?

–আছে আছে, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

এই বলে তিনি আলমারী খুলে একটা কাঠের সুদৃশ্য বাক্স বের করলেন। এটা তার কুরআন শরীর রাখার বাক্স। আব্বু বাক্সটা তায়িফের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

–আমি তো কুরআন শরীফ চাইনি। আমি কুরআন শরীফ দিয়ে কী করবো? আমি বন্ধুদেরকে বলেছি বাইকের কথা। আমি এখন তাদের কাছে মুখ দেখাবো কী করে? একথা বলে বাক্সটা বিছানায় রেখে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পেছন থেকে আম্মু অনেক ডাকলেন, তায়িফ অভিমানে ফিরেও তাকালো না।

তায়িফ ঠিক করলো আর ঘরে ফিরবে না। বন্ধুবান্ধবের সাথেও দেখা করবে না। কোনও আত্মীয়ের বাড়িতেও উঠবে না। লুকিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। তাই করলো।

বেশ কিছুদিন পর তার মনে অনুশোচনা জাগলো। বুঝতে পারলো, তার এভাবে হুট করে বের হয়ে আসা উচিত হয়নি। আব্বুর কোনও সমস্যাও থাকতে পারে। সেটা বলার সময় তো সে দেয়নি।

তায়িফ বাড়ি ফিরে এলো। একমাস পর। ঘরে ঢুকে দেখলো আম্মু একা একা বসে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। তাকে দেখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তায়িফের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। আম্মু এই একমাসেই অনেক বুড়িয়ে গেছেন। শরীর একদম ভেঙে গেছে। সে পাশে গিয়ে বসলো। সে আম্মু বলে ডাক দিতেই তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

–আব্বু অফিস থেকে ফিরেননি?

আম্মু উত্তর দিলেন না। অনেকবার প্রশ্ন করার পর তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে যা বললেন, শুনে তায়িফ মাথা ঘুরে পড়ে গেলো।

সেদিন তায়িফ চলে যাওয়ার পর আব্বু ভেবেছিলেন পাগল ছেলেটা ফিরে আসবে। রাত গভীর হলো, সকাল হলো, দুপুর হলো, বিকেল পেরিয়ে রাত হলো। তায়িফ এলো না। আব্বু ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নানাদিকে দৌড়ঝাঁপ করতে করতে তার প্রেশার বেড়ে গিয়েছিলো। একরাতে স্ট্রোক করলেন। আগে তো দুইবার হয়েছে। এবার শেষবার ছিলো।

তায়িফ কোনমতে তার কামরায় আসলো। সবকিছু আগের মতোই আছে। পড়ার টেবিলের উপর দেখলো সেই কুরআন শরীফের বাক্সটা রাখা। সে কৌতূহলভরে বাক্সটা খুললো। তায়িফ স্তব্ধ হয়ে গেলো। দেখলো, বাক্সের মধ্যে একটা সুন্দর কুরআন শরীফ রাখা। তার পাশেই রাখা আছে বাইকের চাবি। চাবির সাথে একটা চিরকুটে লেখা,

"তারা এন্টারপ্রাইজে বাইকটা রাখা আছে"।

-তোমার আব্বু।

জীবন জাগার গল্প : ১৯৯

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

ড. গ্যারি মলিয়ের। গণিত ও যুক্তিবিদ্যা বিভাগের প্রধান। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়। কানাডা। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিস্টবাদের প্রচারকও বটে। অধ্যাপনার পাশাপাশি ছাত্রদের মাঝে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হলো মুসলিম ছাত্ররা। বিশেষ করে আরব।

তার গণিত ক্লাশে, সাবসিডিয়ারি বিষয়ের অংশ হিসেবে, একজন ছাত্র আসে। মেড ফিলালি। তিউনিসিয়ান। তুখোড় ছাত্র। সেদিন লগারিদমের আলোচনা এলো। সেই সূত্রে এলো আবু বাকার আল খাওয়ারিজমির কথাও। কারণ তিনিই তো এর আবিষ্কারক।

এই সূত্র ধরে আলোচনা চলে এলো ধর্মে। ধর্মের আলোচনার খেই ধরে এলো বিভিন্ন ধর্মের তুলনা। তুলনার আলোচনার খেই ধরে এলো ধর্মগ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধির আলোচনা। আর যায় কোথায়, লেগে গেলো গুরু-শিষ্যের লড়াই।

মেড বললো,

–স্যার, বাইবেলকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে আমার কষ্ট হয়।

–কেন, কী হয়েছে?

–কারণ বাইবেল অসংখ্য অসঙ্গতিতে ভরা।

–তোমাদের কুরআনে কি কোন অসঙ্গতি নেই?

–জি না, স্যার। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি।

–আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যাচাই করে দেখবো।

সেই থেকে শুরু হলো, ড. মলিয়ের-এর কুরআনে ভুল আর অসঙ্গতি খোঁজার অভিযান। ডক্টর সাহেবের ধারণা যে গ্রন্থ চৌদ্দশ বছর আগের, সেটাতে তো ভুলচুক থাকবেই। এ আর এমন কি। তার আশা ছিলো এই কিতাব যেহেতু মরুভূমির আবহ থেকে রচিত, সেই হিসেবে সেখানে মরুভূমির ব্যাপক আলোচনা থাকবে। কিন্তু সে ধরনের কোনও আলোচনা তিনি পেলেন না।

তার ধারণা ছিলো এই গ্রন্থে মুহাম্মাদের (সা.) জীবনের নানা দুঃখ-কষ্টের আলোচনাও থাকবে। তার বাবা-মার মৃত্যু, প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুর কথা থাকবে, কিন্তু এসবের কিছুই নেই।

তার বিস্ময় বেড়ে গেলো যখন দেখলেন কুরআন কারীমে মরিয়ম (আ.) কে নিয়ে গোটা একটা সূরাই আছে। এমন সম্মান তাদের বাইবেলেও মরিয়মকে দেয়া হয়নি। খাদীজা-আয়িশা-ফাতিমার নামে কোনও সূরা নেই।

ডক্টর মুলার আরো দেখলেন, পুরো কুরআনে 'ঈসা' নামটা চব্বিশ (২৪) বার এসেছে, অথচ মুহাম্মাদ নামটা এসেছে সাকুল্যে চারবার। তার বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

তিনি লা জওয়াব হয়ে গেলেন, সূরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াত দেখে,

(তারা চিন্তা করে দেখে না, সেটা (কুরআন) যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তারা তাতে (কুরআনে) অসংখ্য অসঙ্গতি খুঁজে পেতো)।

অধ্যাপক বললেন,

–বর্তমানে, জ্ঞানচর্চার একটা স্বীকৃত মূলনীতি হলো "কোনও থিউরি বা বইয়ের বিশুদ্ধতা ও কার্যকারিতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত তার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই (Falsification test) অব্যাহত রাখতে হবে।"

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুরআন কারীমে নিজেই সবাইকে (মুসলিম ও অমুসলিমকে) আহ্বান করছে তার মধ্যে কোনো ভুল আছে কি না যাচাই করে দেখতে।

পৃথিবীতে এমন কোনও লেখক পাওয়া যাবে না, যিনি একটা বই রচনা করে দাবি করবেন, আমার এই বই যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত।

অথচ কুরআন নিজেই জোরালো দাবি করছে, তার মধ্যে কিছুতেই কেউ কোনও ভুল বের করতে পারবে না।

সূরা আম্বিয়া পড়তে গিয়ে ডক্টর আবার থমকে দাঁড়ালেন। ত্রিশ নাম্বার আয়াতে আছে,

–(কাফিররা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও যমীন দুটি ছিলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমি সে দুটিকে বিচ্ছিন্ন করেছি। আর পানি

থেকেই প্রতিটি জীবিত বস্তুকে সৃষ্টি করেছি, তবে কি তারা ঈমান আনবে না?)।

১৯৭৩ সালে বিগব্যাঙ (মহাবিস্ফোরণ) থিউরির জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। পৃথিবী প্রথমে জমাটবদ্ধ অবস্থায় ছিলো। একটা মহাবিস্ফোরণের ধাক্কাতেই মহাবিশ্বের সবকিছু আলাদা হয়।

সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতেই তো বিগব্যাঙ থিউরির প্রতি ইঙ্গিত আছে।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, সমস্ত জীবিত প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, যে কোনও প্রাণীর কোষগুলো তৈরি করা হয়েছে সিটোপ্লাজম (Cytoplasm) দিয়ে। এই সিটোপ্লাজমের মূল গঠন-উপাদানই হলো পানি।

ডক্টর মলিয়ের বলেন, –একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে, চৌদ্দশ বছর আগে এ কথা জানার কথা নয়। এমন দুর্লভ তথ্য মানবাতীত কোনও উৎস থেকেই আসতে পারে। সেটা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ (ওহি) ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে আর দেরি করলেন না।

জীবন জাগার গল্প : ২০০

সিংহের নসীহত

বনের রাজা সিংহ। সবাই ভয় পায়। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে অন্য প্রাণীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থেকে উঁকি মারে।

এসব দেখে শিয়ালের ঈর্ষা হলো। আমাকে কেন সবাই এমন ভয় পায় না?

অনেক ভেবেচিন্তে সে ঠিক করলো, সিংহ যখন ভরপেট থাকে কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে, পরামর্শ চাইবে।

–সেলাম, বনপনা (জাঁহাপনা)!

–কী চাস?

–আমিও আপনার মতো হতে চাই। আপনাকে সবাই ভয় করে। সমীহ করে। শ্রদ্ধা করে। আমি চাই, আমাকেও বনের প্রাণীরা এমন ভয় করুক। দয়া করে আমাকে কিছু নসীহত করুন। আমি কিভাবে আপনার মতো শক্তি অর্জন করতে পারি?

–তুই এক কাজ কর। এই পাহাড় থেকে লাফ মেরে ওই ছোট পাহাড়টাতে যা।

–বলছেন কি, বস! অতদূর লাফিয়ে পার হতে গেলে তো আমার পা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

–ভাঙবে না। আমি তোকে জোরসে ধাক্কা দিয়ে পার করে দেবো।

শিয়াল লাফ দিলো। সিংহ কোনও সাহায্য করলো না। শিয়ালের পা ভেঙে গেলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বললো,

–বস্! কই আপনি তো কোনও সাহায্য করলেন না?

–কখনো কারো কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করবি না। এটাই প্রথম নসীহত। যা ভাগ।

জীবন জাগার গল্প : ২০১

পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থা

দেশের রাজা খুবই অত্যাচারী। তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রজারা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গোপনে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। সবাই এক বাক্যে রাজার মৃত্যুকামনা করতে শুরু করেছে। দেশের আপামর জনগণ দিবারাত্রি কল্পনায় রাজার অপসারণ দৃশ্য দেখতে লাগলো। মৃত্যুর কল্পনা করতে থাকলো।

আচানক একদিন রাজ্যের প্রজারা সবাই একটা ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না। তাহলে কি নতুন যুগের সূচনা হলো? ঘোষণায় বলা হলো,

–আর জুলুম নয়। আর নির্দয়তা নয়। রাজ্যের সবাই এখন থেকে ন্যায়বিচার পাবে।

রাজা তার কথামতই দেশ শাসন করতে লাগলেন। রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এলো। যারা পালিয়ে গিয়েছিলো তারাও দলে দলে ফিরতে শুরু করলো। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো হলো।

কয়েক মাস যাওয়ার পর, একদিন দরবার চলাকালে একজন উজির সাহস করে প্রশ্ন করলো।

–জাঁহাপনা! কী এমন কারণ ঘটলো যে, আপনি শাসনপদ্ধতি বদলে ফেললেন?

রাজা বললেন,

–আমি একবার বনে গেলাম। শিকারে। বনের গভীরে যাওয়ার পর দেখলাম, একটা কুকুর শিয়ালকে দৌড়াচ্ছে। শিয়াল প্রাণপণে ছুটলো। দ্রুত গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়লো। কুকুরটাও পিছু পিছু গেলো। তখনো শিয়ালটার একটা পা গর্তের বাইরে ছিলো। কুকুর সেটাকেই কামড়ে আলগা করে ফেললো। বেচারা শিয়াল গর্তের ভেতরে তিন পা নিয়েই আত্মরক্ষা করলো।

এরপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে বনের শেষে একটা গ্রামে গেলাম। সেখানে আগের কুকুরটাকেও দেখলাম। একটা লোকের সামনে ঘেউ ঘেউ করছে। লোকটা আর থাকতে না পেরে একটা বড় পাথর নিয়ে কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পাথর লেগে কুকুরের একটা পা ভেঙে গেলো।

আমি আরো এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সেই কুকুরমারা লোকটাও একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে কোথাও যাচ্ছে। হঠাৎ কী কারণে যেন ঘোড়াটা ক্ষেপে গিয়ে লোকটাকে একটা লাথি মারলো। লোকটার পা ভেঙে গেলো।

ঘোড়াটা ছুট লাগালো। কিছুদূর যাওয়ার দেখলাম ঘোড়াটার একটা পা গর্তে পড়ে একদম ভেঙে গিয়েছে। ঘোড়া পড়ে গিয়ে কাৎরাচ্ছে।

আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম। মনে হলো,

–মন্দ থেকেই মন্দ সৃষ্টি হয়। যদি এভাবে জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাই, আমাকেও একদিন এর মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

জীবন জাগার গল্প : ২০২

কৃষকের বিনিয়োগ

রাজা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখছেন। সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর করছেন। যেতে যেতে এক বিরাট ফসলি ভূমিতে পৌঁছলেন।

রাজামশায় দেখলেন, একজন কৃষক খুশিমনে কৃষি কাজ করছে। রাজা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

–তোমাকে দেখছি অত্যন্ত খুশি মনে কাজ করছো। এটা কি তোমার নিজের জমি?

–জি না জাঁহাপনা। আমি মজুরির বিনিময়ে কাজ করি।

–এত পরিশ্রম করে দিনে কত করে পাও?

–প্রতিদিন চার দিরহাম করে মজুরি পাই।

–এই চার দিরহামে তোমার হয়?

–জি জাঁহাপনা।

= এক দিরহাম আমার নিজের জীবিকার জন্য ব্যয় করি।

= এক দিরহাম দ্বীনের জন্য ব্যয় করি।

= এক দিরহাম ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করি।

= এক দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি।

–তুমি তো দেখি একটা ধাঁধা বললে। তোমার কথা বুঝতে পারিনি। খুলে বলো দেখি।

–এক দিরহাম ব্যয় করি আমার নিজের আর আমার স্ত্রীর জীবিকার জন্য।

= এক দিরহাম ব্যয় করি, আমার আব্বা-আম্মার জন্য। তারাই আমার দ্বীন। তাদের জন্য ব্যয় করলে আল্লাহ খুশি হন।

= এক দিরহাম ব্যয় করি আমার সন্তানদের জন্য। ভবিষ্যতে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তারাই আমার দেখাশোনা করবে।

= আরেক দিরহাম ব্যয় করি আমার দুই অসুস্থ বোনের জন্য। তাদের জন্য ব্যয় করলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমান সওয়াব পাবো বলে আশা রাখি।

রাজা বললেন,

–তুমি তো খুব সুন্দর জীবন যাপন করছো।

রাজা খুশি হয়ে অনেক পুরস্কার দিয়ে বিদায় নিলেন।

জীবন জাগার গল্প : ২০৩

মদ্যপায়ীর জানাযা

সুলতান মুরাদ (চতুর্থ)। পরাক্রমশালী উসমানি খলীফা। রাতে প্রাসাদে শুয়ে আছেন। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন। দু'চোখে ঘুমের দেখা নেই। শেষে বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

সুলতানের প্রিয় একটা অভ্যেস হলো, ছদ্মবেশে রাতের ইস্তাম্বুল ঘুরে ঘুরে দেখা। সাধারণ প্রজাদের হাল-হাকীকত নিজ-চোখে দেখা।

সুলতান প্রধান প্রাসাদরক্ষীকে সাথে নিয়ে চুপিসারে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এলেন। দেখলেন, রাস্তার ওপর একজন লোক শুয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে নাড়া দিলেন। দেখলেন লোকটা মৃত।

সুলতান অবাক হলেন। পথচারীদের উদ্দেশ্যে জোরে হাঁক দিলেন।

–কী ব্যাপার, একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। আর তোমরা কেউ এগিয়ে আসছো না?

আশেপাশের লোকেরা বললো,

–এই লোক যিন্দীক। মদ্যপায়ী। ব্যভিচারী।

–আরে! এই লোক কি আমাদের নবীজির উম্মত নয়? এই লোকের বাড়ি কোথায় দেখিয়ে দাও।

সবাই ধরাধরি করে লোকটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

স্ত্রী সেই লোকটাকে মৃত দেখে কাঁদতে শুরু করলো। সুলতান মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন,

–লোকেরা তোমার স্বামী সম্পর্কে যা বলছে তা কি সত্য?

–বাহ্যিকভাবে সত্য। তবে বাস্তবে অসত্য।

–মানে?

–আমার স্বামী প্রতি রাতে শরাবখানায় যেতেন। সেখান থেকে মদ কিনে এনে ঘরের গোসলখানায় সেসব ঢেলে দিতেন। বলতেন অন্তত একজন মুসলমানকে পাপ থেকে বাঁচাতে পেরেছি। প্রতি রাতে গণিকালয়ে যেতেন। ঘরে ঢুকেই মালকিনকে তিনি এক রাতের মজুরি পরিশোধ করে বলতেন,

–দরজা বন্ধ করে দাও। সকাল পর্যন্ত খুলবে না।

এরপর তিনি ঘরে ফিরে বলতেন,

–আজ রাতে অন্তত একজন যুবককে পাপাচার থেকে বাঁচিয়েছি।

সাধারণ মানুষ তাকে এসব করতে দেখে ভাবতো, আমার স্বামী সত্যি সত্যি এসব করতেন। তারা তো ভেতরের খবর জানে না। তাই নানা কথা বলতো। নানা দুর্নাম রটাতো। লোকদেরও দোষ নেই। তারা যা বাহ্যিকভাবে দেখতো তাই বলতো। আমি তাকে বলতাম,

–আপনি মারা গেলে তো গোসল-জানাযা দেয়ার লোকও পাওয়া যাবে না।

একথা শুনে তিনি হেসে বলতেন,

–কী বলছো তুমি? তুমি দেখে নিও, আমার মৃত্যুর পর গোসল দেয়ার মানুষের অভাব হবে না। আমার জানাযায় দেশের সুলতান থেকে শুরু করে আলিম-সালিহ সবাই শরীক হবে।

সুলতান বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

–আমিই সুলতান মুরাদ। আগামীকাল আয়া সোফিয়া মসজিদ চত্বরে তোমার স্বামীর জানাযা হবে। ইনশাআল্লাহ।

বাহ্যিক অবস্থা দেখে মানুষকে বিচার করা ভুল। যদিও ফতোয়া বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

জীবন জাগার গল্প : ২০৪

সততার পুরস্কার

অনেক কাল আগে, মক্কায় এক দম্পতি বাস করতো। স্বামী যেমন তেমন, স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার। একদিন সকালে স্ত্রী বললেন,

–ঘরে তো খাওয়ার মতো কিছুই নেই। বাজারে গিয়ে দেখুন না, কোনও কাজ জোটে কি না। হয়তো আল্লাহ কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

স্বামী বের হয়ে গেলেন। অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোন কাজ জোটাতে পারলেন না। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কা'বার ছায়ায় এসে বসলেন। দুই রাকাত নামায পড়লেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে নিজের অসহায়ত্বের কথা বললেন। নিজের এবং পরিবারের অভুক্ত অবস্থার কথা জানালেন।

দু'আ শেষ করে কিছুদূর আসার পর দেখলেন, একটা থলে পড়ে আছে। থলেটা উঠিয়ে খুলে দেখলেন, ভেতরে এক হাজার দীনার আছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, আশেপাশে কেউ নেই। এই ভর দুপুরে সবাই খোলা চত্বর ছেড়ে ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

থলেটা নিয়ে বাসায় চলে এলেন। স্ত্রীকে বিষয়টা খুলে বললেন।

–আমাদের কষ্টের দিন শেষ। এবার আর না খেয়ে থাকতে হবে না। কারো অধীনে মজুরিও খাটতে হবে না।

–না জনাব! এই থলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এটা আমাদের জন্য হারাম। কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ভোগ করা ঠিক নয়। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘোষণা দিন যে, আপনি একটা থলে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

স্বামী আবার ফিরে এলো। হেরেমে প্রবেশ করতেই একটা ঘোষণা কানে এলো। একজন বলছে,

–কেউ কি একটা থলে পেয়েছেন? দয়া করে থলেটা পৌছে দিন।

–এই যে, আমি পেয়েছি থলেটা। এই নিন।

ঘোষণাকারী অনেকক্ষণ ধরে দরিদ্র লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

—এই থলি আপনি নিয়ে যান। এখন থেকে আপনিই এই থলের মালিক। এই নিন, আরো নয়শত দীনার।

দরিদ্র লোকটা তো ভীষণ অবাক।

—ভাই! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমার বাড়ি সিরিয়ায়। মক্কায় আসার সময়, সেখানকার এক ব্যবসায়ী, আমার হাতে এই থলে দিয়ে বলেছেন,

—এই থলেতে দশ হাজার দীনার আছে। আপনি এখান থেকে নয় হাজার দীনার সরিয়ে রেখে, বাকি এক হাজার দীনারসহ থলেটা কোনও খোলা জায়গায় ফেলে রাখবেন। এরপর ঘোষণা দিবেন। যে ব্যক্তি থলেটা পেয়ে ফেরত দিতে আসবে তাকে বাকি নয় হাজার দীনারসহ থলেটা হাদিয়া দিয়ে দেবেন। এটা তার সততার পুরস্কার।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার জন্য রাস্তা খুলে দেবেন। আর তার রিযিকের বন্দোবস্ত করবেন এমন স্থান থেকে, যা তার ধারণারও অতীত। সূরা তালাক : ৩)

জীবন জাগার গল্প : ২০৫

তিন বন্ধু

পাকেচক্রে একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেলো 'জ্ঞান, সম্পদ ও সম্মানের মাঝে। তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হলো।

সম্পদ বললো,

—মানুষের ওপর আমার জাদুকরি প্রভাব অনস্বীকার্য। ছোট বড় সবাই আমার আকর্ষণে পতঙ্গের মতো ছুটে আসে। আমার দ্বারাই সংকট-সমস্যা কেটে যায়। আমি না থাকলে দুর্দশা-দুর্ভোগের পাহাড় নেমে আসে।

জ্ঞান বললো,

—আমার কাজ মানুষের মন-মস্তিস্ক নিয়ে। আমি প্রজ্ঞা ও যুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন সংকট সমাধান করি। নানা আইন-কানুন দিয়ে অচলাবস্থা দূর করি।

আমার এসব করতে কোনও দিরহাম-দীনার লাগে না। মানুষের তিন শত্রুর বিরুদ্ধে, আমি সর্বদা যুদ্ধে থাকি। অজ্ঞতা, দারিদ্র, রোগ-বালাই।

মর্যাদা বললো,

–আমি এক অমূল্য বিষয়। আমাকে টাকায় কেনা যায় না। বিক্রি তো নয়ই। যে আমার প্রতি আগ্রহী হয় আমি তাকে নানা মর্যাদায় ভূষিত করি। যে আমার ব্যাপারে শিথিলতা করে, আমি তার মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিই।

অনেক কথাবার্তা হলো। এবার বিদায়ের পালা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পর প্রশ্ন করলো,

–আমাদের আবার কোথায় দেখা হবে?

সম্পদ বললো,

–আমার দেখা পেতে চাইলে, হাটে-বাজারে, বড় বড় প্রাসাদে গেলেই হবে।

জ্ঞান বললো,

–আমি সবসময় বিদ্যালয়ে, মাদরাসায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকি। জ্ঞানীদের মজলিসে থাকি। মসজিদের তা'লীমে থাকি।

মর্যাদা কিছু না বলে চুপ রইলো। দুই বন্ধু প্রশ্ন করলো,

–তুমি কিছু বললে না যে? তোমাকে কোথায় পাবো বললে না তো?

মর্যাদা বললো,

–আমি একবার চলে গেলে আর ফিরে আসি না। আমাকে খুঁজে লাভ নেই।

জীবন জাগার গল্প : ২০৬

ইঞ্জিনের অপারেশন

ডাক্তারের গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেলো। ওয়ার্কশপে গেলেন। মোটর মেকানিক গাড়িটা দেখে বললো,

–ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঘন্টাখানেক সময় লাগবে।

–ঠিক আছে, আমি বসছি। আপনি কাজটা দ্রুত শেষ করে দিন। গাড়িটা আমার খুবই প্রয়োজন।

মেকানিক কাজ করছে আর ডাক্তারের সাথে টুকটাক কথা বলছে। দুঃখ করে বললো,

–দেখুন ডাক্তার সাহেব! আমার আর আপনার কাজ প্রায় এক।

–কিভাবে?

–আপনি মানুষের ইঞ্জিন ঠিক করেন। আমি গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক করি।

–এক হিশেবে তো ঠিক আছে।

–কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কাজের ধরণটা এক হলেও আপনি কত বেশি টাকা পান, আর আমি কত কম টাকা পাই!

–আপনি দুজনের কাজটা যতটা একরকম ভাবছেন, বাস্তবে তা নয়। আমি যেভাবে কাজ করি সেভাবে আপনি কাজ করতে জীবন গেলেও পারবেন না।

-কেন না? অবশ্যই পারবো।

ডাক্তার বললেন,

–আমি অপারেশানের আগে মানুষের ইঞ্জিন চালু রেখেই অপারেশন করি। বন্ধ করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আপনি গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে অপারেশন করেন। চালু রেখে পারবেন না। পার্থক্যটা এখানেই।

অনেক কাজ বাহ্যিকভাবে দেখতে এক রকম মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। এক দেখাতেই সিদ্ধান্তে চলে আসা ঠিক নয়।

জীবন জাগার গল্প : ২০৭

উপকারের প্রতিদান

সুহাইল থাকে সৎ মায়ের সংসারে। সে যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তখন তার আপন মা মারা যান। বাবা অন্য শহরে চাকরি করেন।

সংসারের সব কাজ সুহাইলই করে। তাদের গ্রামে পানির খুবই সংকট। সবাইকে দূরের এক কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। পানি আনার এই কষ্টের কাজটা তাকেই করতে হয়। তার আরো সৎ ভাইবোন আছে, তার ঘরের কুটোটাও নাড়তে চায় না। আর সৎ মা সেটা চানও না।

সুহাইল উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। আবার পড়াশুনাটাও ভালোভাবে করার চেষ্টা করে। ছোট মামা বলেছেন,

–ভালোভাবে পড়ালেখাটা চালিয়ে যা। আপা মারা যাওয়ার আগে, তোর দায়-দায়িত্ব আমাকেই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমার সামর্থ্যের কথা তো তুই জানিস। তবে চিন্তা করিস না। এক জায়গায় তোর জন্য বৃত্তির আবেদন করেছি। সেটা হয়ে গেলে তোকে আর এই কষ্টের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে না।

সুহাইল প্রতিদিন ভোরে কলস নিয়ে বের হয়ে যায়। পানি আনার সময় গ্রামের দুজন বৃদ্ধা পথের ধারে বসে থাকে। তারা পানি আনতে যেতে পারে না। তারা সব সময় সুহাইলের কাছে পানি চায়। সুহাইল সানন্দেই তাদেরকে পানি দেয়। এজন্য তাকে প্রতিদিন আধভর্তি কলস নিয়েই ফিরতে হয়। সৎ মা অনেক বকাবকি করেন। সেদিন সৎ মায়ের বাপের বাড়ি থেকে কয়েক জন মেহমান এসেছিলেন। অন্যদিনের তুলনায় পানি বেশি দরকার হলো। আজ কলসির পানি অর্ধেক দেখে সৎ মা তাকে উঠোনে সবার সামনেই মারধর শুরু করলো।

সুহাইল প্রতিজ্ঞা করলো, আর কাউকে পানি দেবে না। দুই বৃদ্ধ পানির পিপাসায় মরে গেলেও, তাদের কাকুতি মিনতিতে সে টলবে না।

পরদিন সে কলসি মাথায় ফিরছিলো। দেখলো, গ্রামের বড় অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায় একজন অপরিচিত লোক শুয়ে আছে। পানির পিপাসায় ছটফট

করছে। তার মাথায় পানির কলসি দেখে লোকটা করুণভাবে পানি চাইলো। সুহাইল পানি দিবে না দিবে না করেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টালো। সৎ মায়ের মারের কথা মনে পড়লো। কিন্তু মুমূর্ষু লোকটার অবস্থা দেখে সে আর থাকতে পারলো না। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলো। আজো আধভরা কলসি মাথায় ঘরে ফিরলো। দুপুরে খাবার খেয়ে সুহাইল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো। একটু পরে দরজার খটখট আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেলো। দরজা খুলে সে অবাক। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সেই অশ্বথ-তলার মুমূর্ষু লোকটা।

–আপনি?

–আমি ডাকপিয়ন। এ বাড়িতে কি সুহাইল নামে কেউ থাকে?

–জি আমিই সুহাইল।

–এই নাও, তোমার চিঠি। আর এই নাও তোমার জেলা স্কুলে ভর্তির অনুমতি পত্র। তোমার জন্য জেলা স্কুল থেকে বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়েছে। আর পানির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তখন আমি সত্যি সত্যিই পিপাসায় মারা যেতে বসেছিলাম।

সমাপ্ত। আলহামদুলিল্লাহ।